বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী।

# ভারতের ইতিহাস।

## হিন্দু ও মুসলমান-রাজত্ব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩।

## যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসমুদয়ের নাম।

Muir's Sanskrit Texts.

Mahawanso.

Dr. Rajendralala Mitra's works.

Cunningham's Ancient Geography of India.

Cunningham's History of the Sikhs.

Duff's History of the Marhattas.

Dr. Hunter's Indian Empire.

Ain-i-Akbari.

Wilson's Religious Sects of the Hindus.

Journals of the Royal Asiatic Society and Asiatic Society of Bengal.

Asiatic Researches.

Elphinstone, Sewell, Pope, and Wheeler's History of India.

McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.

Tod's Rajasthan.

List of the objects of Antiquarian interest (compiled under the orders of the Government of India.

Owen's India.

Indian Antiquary.

Bernier's Travels in the Mogul Empire.

বিষ্ণুপুরাণ।

মনুসংহিতা।

নীলমণি বসাক-প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পাণিনি-বিচার।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ইত্যাদি।

# সূচী।

## চতুর্থ অধ্যায়।

### মোগল-বংশ।

# ভারতের ইতিহাস।

## দেশের বিবরণ।

ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্বোপদ্বীপ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, এবং পশ্চিম সীমা আফগানিস্তান ও আরব সাগর। ইহার দৈর্ঘ্য ১,৯০০ মাইল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তারও ১,৯০০ মাইল। ইহাতে প্রায় ২৫ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের অধিবাস আছে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রকৃতি স্বরূপ। ইহার কোন স্থানে তুষার-মণ্ডিত উন্নত পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে, কোন স্থানে গম, যব, রাই, ধান্য প্রভৃতি শস্য-পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র শোভা বিকাশ করিতেছে, কোথাও বিস্তৃত অরণ্য বিবিধ বন্য বৃক্ষ ও বিবিধ বন্য জন্তু-সমূহে পরিবৃত থাকিয়া লোকের ভয় জন্মাইতেছে, কোথাও বা বালুকাপূর্ণ বিশাল মরুভূমি নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে। অনেক দেশের অনেক কবি ও ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য ও শোভার বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বহু বিস্তৃত ও বহু ভাবে পরিপূর্ণ দেশ প্রাকৃত ধর্ম্মানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণ ভারতবর্ষ বা দক্ষিণাপথ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত,

ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ উত্তর ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ভারতবর্ষ বা দক্ষিণাপথ বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিন্দু কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আর্য্যাবর্ত্ত দুই অংশে বিভক্ত। ইহার এক ভাগ সিন্ধু নদ ও তাহার পঞ্চ শাখার জলে বিধৌত হইতেছে, অন্য ভাগ গঙ্গা, তাহার উপনদী সমূহ ও ব্রহ্মপুত্র হইতে জলরাশি প্রাপ্ত হইতেছে। সিন্ধুর পঞ্চ শাখার নাম, শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা। এই পাঁচটিকে মুসলমানেরা যথাক্রমে সত্তলজ, বিয়া, চিনাব, রাবি ও জেলম নামে নির্দ্দেশ করেন। এই পঞ্চ সরিৎ যে ভূখণ্ড দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম পঞ্জাব। আপ শব্দের অর্থ জলরাশি। পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চ নদীর জলে সিক্ত বলিয়া পঞ্জাব (পঞ্চ-আপ) নাম হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে আসাম বিভাগ। ইহা পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল; এক্ষণে স্বতন্ত্র হইয়া এক জন প্রধান কমিশনরের অধিকারে স্থাপিত হইয়াছে। আসামের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ :—

কামরূপ। ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। রঘুবংশীয় রাজা দশরথের পিতামহ রঘু দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে আসিয়া এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গৌহাটী আসামের প্রধান নগর। সিলঙ্গ খাসিয়া পাহাড়ে। এই স্থানে আসামের প্রধান কমিশনর অবস্থিতি করেন।

আসামের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি। ইহা বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর নামক পার্ব্বত্য ভূভাগ এই প্রেসিডে-

ন্সির অন্তর্গত। সমৃদ্ধি ও জনসংখ্যায় এই প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উন্নত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে নিম্ন-লিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে :—

বঙ্গদেশ—জেলা ২৪ পরগণায় কলিকাতা। নদীয়া অথবা নবদ্বীপ ; বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণ সময়ে এই স্থানে সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। পলাশী মুর্ষিদা-বাদের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথীর তীরে ; লর্ড ক্লাইব এই স্থানে সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা হস্তগত করেন। বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান ; এই স্থানে শূরবংশীয় শের আফগান দিল্লীর বাদশাহ জাহাঁগীরের চক্রান্তে নিহত হন। হুগলী জেলায় হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগর ; পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ সাতগাঁ হুগলীর নিকটবর্ত্তী ; এক্ষণে ইহা একটি সামান্য পল্লীর মধ্যে পরিগণিত। মুর্ষিদাবাদ জেলায় মুর্ষিদাবাদ, এই স্থান বাঙ্গালার নবাবদিগের রাজধানী ; মুর্ষিদকুলিখাঁ নামে এক জন নবাবের নামানুসারে এই নগরের নাম মুর্ষিদাবাদ হয়। মালদহ জেলায় গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। সেনবংশীয় মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে ইহা লক্ষ্মণাবতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ স্থানে পূর্ব্বতন মুসলমানরাজাদিগের রাজধানী ছিল। ঢাকা জেলায় ঢাকা। দিল্লীর বাদসাহ জাহাঁগীরের নামে ইহার নাম জাহাঁগীর নগর হয়। সোণারগাঁ ; এক্ষণে ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। চট্টগ্রাম জেলায়, চট্টগ্রাম ; মুসলমানেরা ইহাকে ইস্লা-মাবাদ নামে নির্দ্দেশ করিত।

বিহার—পাটনা জেলায় পাটনা। ইহার প্রাচীন নাম পাটালীপুত্র, গ্রীকেরা ইহাকে পালিবথ্রা নামে নির্দ্দেশ করিত।

ইহা প্রসিদ্ধ মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী। চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজারা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। শাহাবাদ জেলায় আরা, বক্সার, শাসিরাম ও রোটস্ দুর্গ। ত্রিহুত জেলায় হাজীপুর ও দ্বারবঙ্গ। মুঙ্গের জেলায় মুঙ্গের।

উড়িষ্যা—মধ্য উড়িষ্যার কটক ও জাজপুর, দক্ষিণ উড়িষ্যায় পুরী বা জগন্নাথ, এবং উত্তর উড়িষ্যায় বালেশ্বর।

বিহারের উত্তর-পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অবস্থিত। এই প্রদেশ এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। এই প্রদেশে অনেকগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে। তৎসমুদয়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

বারাণসী বিভাগে বারাণসী বা কাশী। গাজীপুর ; চুনার, এই স্থানের পার্ব্বত্য দুর্গ সবিশেষ প্রসিদ্ধ ; জৌনপুর। এলাহাবাদ বিভাগে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ (গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলন-স্থান) কাণপুর। আগরা বিভাগে, আগরা ফতেপুরসিক্রি, চান্দোয়া বা ফিরোজাবাদ, কনৌজ (কান্যকুব্জ) এবং মথুরা। মিরাট বিভাগে মিরাট। ঝাঁসি বিভাগে ঝাঁসি। রোহিলখণ্ড বিভাগে বিজনৌর।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উত্তরে ও রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশ। এই প্রদেশ সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও জনপূর্ণ। ইহার নিম্নলিখিত স্থানগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ :—

মধ্য অযোধ্যায় লক্ষ্ণৌ, পূর্ব্ব অযোধ্যায় অযোধ্যা (রঘুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী) ও ফৈজাবাদ।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে পঞ্জাব প্রদেশ। পঞ্জাব সিন্ধু নদের উন্নত ভাগে উপস্থিত। এই প্রদেশে কাশ্মীর, কপূর্‌রতলা, পত্তি-

মালা, ঝিন্দ ও নাভা নামে কয়েকটি প্রসিদ্ধ করদ ও মিত্র রাজ্য আছে। পঞ্জাবের এই স্থানগুলি ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ :—

দিল্লী বিভাগে দিল্লী, মুসলমান সম্রাটগণের রাজধানী; কেহ কেহ বলেন, ধিলু নামে এক জন রাজার নামানুসারে ইহার দিল্লী নাম হইয়াছে। ইহার নিকটে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হস্তিনাপুর কুরুপাণ্ডবের রাজধানী। দিল্লীর উত্তরে, কর্ণাল ও পানিপথ (পানিপথের তিনটি যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। যথাস্থলে ইহার বিবরণ লিখিত হইবে)। অম্বালা বিভাগে সরস্বতী নদীর তীরে থানেশ্বর; কুরুক্ষেত্র ও রামনারায়ণপুর গ্রাম ইহার নিকটবর্ত্তী। রামনারায়ণপুর সচরাচর তিরৌরী নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ গোরীর সহিত সমরে জয়ী হন। লুধিয়ানার নিকট মচ্ছিবারা, ও সহিন্দ। জলন্ধর বিভাগে কাঙ্গড়া ও নগরকোট। লাহোর বিভাগে, লাহোর ও শতদ্রুর দক্ষিণে ফিরোজপুর, ফিরোজসহর, মুদকী ও সোব্রাঁও, এই স্থানে ১৮৪৭ অব্দে শিখদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের তুমুল যুদ্ধ হয়। সোব্রা নামে একটি জাতির নামানুসারে সোব্রাঁও নাম হইয়াছে। রাবলপিণ্ডী বিভাগে (গ্রীকগণ ইহাকে তক্ষিলা নামে নির্দ্দেশ করিত) আটক, চিলিয়ানবালা (এই স্থানে শিখ-সেনাপতি শেরসিংহ ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য পরাজিত করেন) ও গুজরাট (১৮৪৯ অব্দে এই স্থানে শিখদিগের পরাজয় হয়)। পেশাবর বিভাগে পেশাবর; পেশাবর ও আফগানিস্তানের মধ্যে খাইবার নামে একটি গিরি-সঙ্কট আছে। মুলতান বিভাগে মুলতান।

পঞ্জাবের দক্ষিণে, ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিমে, রাজপুতনা অথবা রাজপুতদিগের রাজ্য অবস্থিত। ১৮টি করদ রাজ্য লইয়া রাজপুতনা হইয়াছে। রাজপুতনায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর আছে :—

মিবার রাজ্যে উদয়পুর। প্রসিদ্ধ চিতোর ইহার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। অজমীঢ় বিভাগে অজমীঢ়। জয়পুর রাজ্যে জয়পুর, বর্ত্তমান রাজধানী, পূর্ব্বতন রাজধানী আম্বের। প্রসিদ্ধ রন্থাম্বর দুর্গ ইহার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। মাড়বার রাজ্যে যোধপুর। ভরতপুর রাজ্যে ভরতপুর। এই স্থানের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড কম্বরমিয়র শেষে ইহা অধিকার করেন।

রাজপুতনার দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। এক জন গবর্ণর এই প্রেসিডেন্সি শাসন করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে :—

গুজরাট প্রদেশে সুরত, প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র। বাণিজ্যের জন্য এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিভাগে প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির ছিল। কঙ্কণ প্রদেশে বোম্বাই বা মুম্বই। প্রসিদ্ধ মুম্বাদেবীর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে। এই নগর বোম্বাইর গবর্ণরের আবাস-স্থান। সালসেট দ্বীপে তানা। তানার উত্তর-পশ্চিমে বাসিন। মহারাষ্ট্রে পুণা, ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী। খিড়কী ও পুরন্দর দুর্গ ইহার নিকটবর্ত্তী। নিজামশাহী রাজ্যের রাজধানী আহম্মদনগর। আদিলশাহী রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। শিবজীর বংশধরদিগের রাজধানী সেতারা। সিন্ধুপ্রদেশে হয়দরাবাদ। অমরকোট ইহার নিকটবর্ত্তী; এই স্থানে মোগল সম্রাট্

আকবর শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাত্তা সিন্ধুর পূর্ব্বতন রাজধানী, প্রাচীন নাম পাতাল। প্রসিদ্ধ করাচী বন্দর ইহার সমীপবর্ত্তী।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি করদ রাজ্য আছে। এই রাজ্যের সমষ্টি মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়ার অধিকৃত গোবালিয়র রাজ্য, মহারাজ হোলকারের অধিকৃত ইন্দোর রাজ্য, এবং ভূপাল, রীবাঁ প্রভৃতি প্রধান। মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সির মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেঃ—

সিন্ধিয়ার রাজ্যে গোবালিয়র; মহারাজপুর ইহার নিকটবর্ত্তী। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী অবস্থিত। হোলকারের রাজ্যে ইন্দোর। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী মেহিদপুর। ভূপালরাজ্যে রাইসিন। শূরবংশীয় শের শাহ এই স্থান অধিকার করেন।

মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সির দক্ষিণে এবং ছোট নাগপুর বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত। মধ্যদেশে বুরহানপুর, তৎসমীপবর্ত্তী অজীমগড় ও নাগপুর ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। নাগপুরে বেরার প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল।

মধ্যদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেরার। গবর্ণরজেনেরল লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৩ অব্দে এই জনপদ ঋণপরিশোধের নিমিত্ত হয়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে কিয়ৎকালের জন্য গ্রহণ করেন। তদবধি উহা ইঙ্গরেজদিগের অধীনেই রহিয়াছে।

বেরারের দক্ষিণে নিজামের অধিকৃত হয়দরাবাদ রাজ্য। এই রাজ্যে এই কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছেঃ—

হয়দরাবাদ ( রাজধানী ), গোলকুণ্ডা এই স্থানে কুতবশাহী রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বিদর বারিদশাহী রাজাদিগের রাজধানী। কুলবর্গা নগর ইহারই নিকটবর্ত্তী, এই স্থানে বাহমনীবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। খড়কী ( বর্ত্তমান আওরঙ্গাবাদ ) মালেকআম্বরের পূর্ব্বতন রাজধানী। আওরঙ্গাবাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দেবগিরি, এক্ষণে ইহা দৌলতাবাদ নামে বিখ্যাত। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তগলক এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আসাই আওরঙ্গাবাদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ হয়।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর সরকারে মছলিপত্তন ও গন্তুর ; কর্ণাটে মাদ্রাজ, চেঙ্গলপট্ট, কাঞ্চীপুর ও আর্কাড়ু। দক্ষিণ আর্কাড়ুতে কডালুর, জিঞ্জি, ও ফরাসীদিগের অধিকৃত পঁদিচেরী ফোর্ট সেণ্টডেবিডের ভগ্নাবশেষ এই বিভাগে আছে। ত্রিচিনপল্লী জেলায় ত্রিচিনপল্লী। তাঞ্জোরে তাঞ্জোর। মাদুরায় মাদুরা।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে কান্দাহার অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম গন্ধার। ইহা দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারীর জন্মস্থান। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শলাতুর নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ। ইহার প্রাচীন নাম লঙ্কা ; রামায়ণে ইহা এই নামেই উক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে

বঙ্গের রাজকুমার বিজয়সিংহ এই দ্বীপ অধিকার করেন। অনেকের মতে এই বিজয় সিংহের নামে লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে। এই দ্বীপ সাতিশয় শস্য-সম্পত্তিশালী। ইহা এক্ষণে ইঙ্গ্‌রেজদিগের অধিকৃত। ইঙ্গরেজেরা ইহাকে শিলোন কহেন। এক জন শাসনকর্ত্তা ইঙ্গ্‌লণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিয়া, এই দ্বীপ শাসন করেন। এই দ্বীপের আর দুইটি প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী ও পালিসীমন্ত।

উত্তর ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের অধিকাংশ প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। এই হিন্দুআর্য্য-দিগের মধ্যে পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী প্রভৃতি অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে। পঞ্জাবীগণ গুরমুখী, হিন্দুস্থানীগণ হিন্দী, বাঙ্গালীগণ বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করে। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসিগণ গুজরাটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। এতদ্দেশে যে সমস্ত মুসলমান আছে, তাহারা আফগান, পাঠান বা মোগল-দিগেব সন্তান। ইহাদের মধ্যে উর্দ্দু বা হিন্দী ভাষা প্রচলিত আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মধ্যভারতীয় এজেন্সি ও বেরার প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় লোক বাস করে। ইহাদের ভাষা মহা-রাষ্ট্রীয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতিতে দ্রাবিড়ীয় হিন্দু জাতির বাস। তৈলঙ্গী, তামিল, মলারী প্রভৃতি জাতি এই দ্রাবিড়ীয় হিন্দু জাতির শাখা। এই জাতীয় লোকের মধ্যে তামিল, মলারী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষা চলিত আছে।

---

# প্রথম অধ্যায়।

## হিন্দুদিগের রাজত্ব।

ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইঙ্গরেজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ইতিহাসও হিন্দু, মুসলমান ও ইঙ্গরেজ, এই তিন জাতির রাজত্বে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্ব বর্ণিত হইবে।

অনেকে বলেন, হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস ছিল না। হিন্দুগণ অতিশয় কল্পনাপ্রিয় ছিলেন, এই কল্পনাপ্রিয়তায় তাঁহারা সকল বিষয়ই অতিরঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন। কেহ কোন জ্ঞাতব্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এই মত তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। এক্ষণে ইঙ্গ্লণ্ড প্রভৃতি সভ্য জনপদে যেমন ধারাবাহিক ও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে লিখিত ইতিহাস আছে, প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমন কোন ইতিহাস ছিল না বটে, কিন্তু অবশ্যজ্ঞাতব্য লিখিত বিষয়ের অভাব ছিল না। অনেকে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। এগুলি ইতিহাসস্থানীয় হইতে পারে। রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে। কহ্লণ পণ্ডিত ১,২০০ খ্রীঃ অব্দে ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন। কাশ্মীরের কোন্ রাজা কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকালে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায়। আবু-

য়লফজল নামে আকবরের একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। আবুয়লফজল আপনার কল্পনায় এই ইতিহাস লিখেন নাই; তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত বিবরণ হইতে ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এক সময়ে ইতিহাসের বিষয় বর্ত্তমান ছিল।

চীন দেশের এক জন বৌদ্ধ ভ্রমণকারী খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; এই ভ্রমণকারীর নাম হিউএন্ থ্সঙ্গ্। ইনি ৩৫ বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও নানা স্থানের বৌদ্ধ মন্দিরপ্রভৃতি দর্শন করেন। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে রাজকীয় ঘটনার দৈনন্দিন বিবরণ লিখিত হইত। রাজকীয় কোন কোন কর্ম্মচারী কেবল এই ঘটনা লিখিবার জন্যই নিয়োজিত থাকিতেন। এই সমস্ত বিবরণ "নীলপিট" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই "নীলপিটকে"ও ভারতবর্ষীয় কোন কোন রাজবংশের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ইতিহাস লিখিবার যে পদ্ধতি ছিল, তাহা হিউএন্ থ্সঙ্গের লিখিত বিবরণেও একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সভায় চাঁদবর্দ্দে নামে এক জন কবি ছিলেন। পৃথ্বীরাজের রাজত্ব-সময়ে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় ইনি গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চাঁদ একজন কবি, তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য নামে পরিচিত। তথাপি এ কাব্যেও ভারতবর্ষের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। সুতরাং চাঁদের

গ্রন্থ—পৃথ্বীরায় রাঁসোও একখানি অসম্পূর্ণ ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

রাজতরঙ্গিণী, আবুয়লফজলের ইতিহাস-সংগ্রহ, নীলপিট ও পৃথ্বীরায় রাঁসোর বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি ছিল। এইরূপ আর কত বিবরণ ছিল, এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানাজাতির উপভোগ-সামগ্রী ছিল, অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। হিন্দুদিগের পর যবনগণ, যবনদিগের পর গ্রীকগণ, গ্রীকদিগের পর মুসলমানগণ, মুসলমানদিগের পর ইঙ্গরেজগণ ভারতবর্ষের নানা স্থান আক্রমণ ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এইরূপ উপর্য্যুপরি আক্রমণে অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বোধ হয়, এইরূপ বিপ্লবে ইতিহাসস্থানীয় যাহা কিছু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে মুদ্রণ-প্রণালী প্রচলিত ছিল না, ব্রাহ্মণগণ সমুদয় বিষয় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। সুতরাং জল ও বায়ুর দোষেও এই লিখিত বিষয়ের অধিকাংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এক্ষণে চিরাগত কিংবদন্তী, বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের গ্রন্থাদি এবং প্রস্তর ও তাম্রফলক-খোদিত লিপি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। এই সকলের অবলম্বনে হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিয়দংশে জানিতে পারা গিয়াছে।

**ভারতের আদিম অধিবাসী।**—হিন্দু আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর্য্যদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ও আর্য্যসমাজ হইতে পৃথক্ বলিয়া, ইহারা অনার্য্য নামে কথিত হইয়া থাকে। আর্য্যেরা ইহাদিগকে "দস্যু" বা "দাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দস্যুগণ আর্য্যদিগের ন্যায় সভ্য, সাহসী বা সুশ্রী ছিল না। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখানি ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময়ে হিন্দু আর্য্যেরা আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করিতেন।

**প্রাচীন আর্য্য জাতি।**—অনেকের মতে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ মালভূমি আর্য্যজাতির আদি নিবাস-স্থল। ইহাদের কেহ ভূমি কর্ষণ করিতেন, কেহ পশুপালন করিতেন এবং কেহ মৃগয়ায় রত থাকিতেন। পশুপালক ও মৃগয়াজীবী আর্য্যেরা দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিতেন না। যেখানে পশুদিগের ভাল চারণ-ভূমি পাওয়া যাইত, বা মৃগয়ার সুবিধা হইত, ইহারা সেইখানেই যাইতেন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্য জাতি সাতিশয় ভ্রমণশীল ছিলেন। এই ভ্রমণশীলতা প্রযুক্ত ইহারা দূরতর স্থানে যাইয়া বাস করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। ক্রমে ইহাদের দল পরিপুষ্ট হইল। ইহারা বিভিন্ন স্থানে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এই-

রূপে গ্রীশ-বাসিগণ গ্রীক, ভারত-বাসিগণ হিন্দু, পারস্ত-বাসিগণ পারশীক নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। হিন্দু ও পারশীকগণ দীর্ঘকাল একত্র ছিলেন, পরে ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে ইঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। বোধ হয় এই বিবাদই পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

**প্রাচীন আর্য্য জাতির আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।**—প্রাচীন আর্য্যগণ কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও মৃগয়াদ্বারা আপনাদের উদরান্নের সংস্থান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বিবাহের রীতি ছিল। সকলে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। পিতা পরিবার পালন করিতেন, মাতা আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণ ও ব্যবস্থা করিতেন, এবং দুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেন। এইরূপে পরিবার-রক্ষার ভার পিতার (কর্ত্তার) প্রতি, সাংসারিক কার্য্যের ভার মাতার (কর্ত্রীর) প্রতি, এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার দুহিতা প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত ছিল। প্রয়োজনীয় শিল্প-কার্য্যেও ইঁহাদের কিয়দংশে দক্ষতা ছিল। ইঁহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন, পশুবিশেষের লোম হইতে বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতেন। মৃগয়া-লব্ধ পশুমাংস ও কৃষিক্ষেত্রের গম, যব প্রভৃতি ইঁহাদের প্রধান খাদ্য, এবং সোমরস প্রধান পানীয় ছিল। ইঁহারা দ্যোঃ নামে বজ্রধারী দেবতার আরাধনা করিতেন। পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সকল বিষয়ের কর্ত্তা, তিনি ভক্তিভাবে এই দ্যোঃ ও অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি আরাধ্য দেবতার স্তব করিয়া কুশল প্রার্থনা করিতেন।

**আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন।**—হিন্দু আর্য্যগণ প্রথমে সরস্বতী ও দৃশদ্বতীনদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মা-

বর্ত্তে বাস করেন। সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে বালুকা-গর্ভে বিলীন হইয়াছে দৃশদ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল, বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল। ইহার পর ব্রহ্মর্ষি দেশে হিন্দু আর্য্যদিগের বসতি-বিস্তার হয়। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তর-বর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ নামে আখ্যাত। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি, উভয়ই পুণ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে হিন্দু-দিগের বংশ বৃদ্ধি পাইল, হিন্দুগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্জাব হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের আবাস-স্থান হইল; আর্য্যদিগের বাস-ভূমি বলিয়া এই সমস্ত ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

আর্য্যদিগের সহিত দস্যুগণের যুদ্ধ।— আর্য্যেরা ভারতবর্ষে সমাগত হইলে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী দস্যু-গণ তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল। এই আদিম অধিবাসিগণ অভিনব আক্রমণকারীদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল না, সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আর্য্য-দের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু শেষে ইহারা আর্য্যদিগের পরাক্রমে পরাজয় স্বীকার করিল। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হয় নাই; এক দিনে সমস্ত দস্যু-জনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হয় নাই। এই যুদ্ধ অনেক দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে দস্যুগণের অনেকে আর্য্যদিগের পদা-নত হইল। কেহ কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল; কেহ বা

বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক এই আদিম দস্যুদিগের সন্তান।

আর্য্যদিগের সাহিত্য।—এই সময়ে ঋগ্‌বেদ ভারত-বর্ষবাসী আর্য্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই স্থলে বলা উচিত যে, বেদ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত। বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ এই তিনটি অংশ আছে। সংহিতায় সরলভাবে উপাসনার মন্ত্র, ব্রাহ্মণে আড়ম্বর-পূর্ণ যাগযজ্ঞের পদ্ধতি এবং উপনিষদে ঈশ্বর-চিন্তাঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। বেদ এক সময়ে রচিত হয় নাই। উহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রণীত হইয়াছে। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের অন্যূন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করেন। এ জন্য তিনি বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হন। যাহা হউক, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। আর্য্যদিগের সমস্ত রচনাই মুখে মুখে চলিয়া আসিত। দেবগণের উদ্দেশে অনেক কবিতা রচিত ও গীত হইত। এই সকল কবিতা এখন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র নামে পরিচিত হইতেছে। উপস্থিত সময়ে এই ঋগ্‌বেদের মন্ত্রই আর্য্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। আর্য্যগণ ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহের আবির্ভাব হয়।

**জাতি-বিভাগ।**—আর্য্যগণ প্রথমে কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন। গোরু ও লাঙ্গল, তাঁহাদের উপজীবিকার অবলম্বন ছিল। কোন কোন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ঋ" ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ সাধিত হইয়াছে, এই "ঋ" ধাতুর অর্থ হল-কার্য্য করা। যাহা হউক, আর্য্যগণ এতদ্দেশের আদিম নিবাসীদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যের লোপ হইতে লাগিল। তাঁহারা সাতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন, এ জন্য ধর্ম্ম্যকার্য্য সাধনের জন্য আপনাদের দল হইতে পুরোহিত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এ দিকে চিরন্তন কৃষি-কার্য্যের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অপর দল কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সৃষ্টি হইল। ইহার পর ভারতবর্ষের আদিম জাতির মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি আর্য্যগণের প্রতাপ সহিতে না পারিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইল, আর্য্যগণ তাহাদিগকে আপনাদের দলে লইয়া দাস-শ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। ইহাদের নাম শূদ্র হইল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বৈশ্য কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আর্য্যদিগের সেবা করা শূদ্রদিগের কর্ত্তব্য ছিল।

**অন্যান্য জাতির উৎপত্তি।**—ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের রীতি ছিল। এই অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তানগণ বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে।

**হিন্দু নামের উৎপত্তি।**—আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধু নদের তটে বাস করেন। এই সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি

হয়; আর্য্য ও তাঁহাদের সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ এই হিন্দু নামেই পরিচিত হইয়াছেন।

**হিন্দু আর্য্যদিগের সভ্যতা।**—প্রাচীন কালের হিন্দু আর্য্যগণ অসভ্য ছিলেন না। সে সময়ে শিল্পের কিয়দংশে চর্চা হইয়াছিল। বাণিজ্য-যাত্রা, ক্রয়বিক্রয় ও উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। তখন সুবর্ণময় আভরণ, যুদ্ধের উপযোগী বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ভূমি শস্যশালী ও গোরু প্রভৃতির অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল। হিন্দু আর্য্যগণ সরল-চিত্ত ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাঁহারা বিলাসী বা আলস্য-পরতন্ত্র ছিলেন না। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি, কৃষি-কার্য্যের সুব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান জন্য তাঁহারা প্রগাঢ় ভক্তির সহিত ইন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা করিতেন। দুর্গ সকল প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকিত। গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকে সকলেরই দৃষ্টি ছিল। বিধবাগণ পুনরায় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। আর্য্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা ছিল। গায়ে চাপকানের মত এক প্রকার লম্বা অঙ্গাবরণ থাকিত। সমুদ্র-যাত্রার জন্য জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণের প্রথা ছিল। ক্রমে আর্য্য-সমাজে যাগযজ্ঞের ঘটার বাড়াবাড়ি হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর ক্রমেই বাড়াইতে থাকেন। এই অবধি আর্য্য-সমাজে পুরোহিতের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

**সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি।**—পুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্য-তনয় মনু হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি হয়। সূর্য্যের

ইলা নামে একটি কন্যা ছিল। চন্দ্র-তনয় বুধের সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বুধ চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। রামায়ণ ও মহাভারতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের বিবরণ বর্ণিত আছে। এই দুই গ্রন্থকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

রামায়ণ।—মহারাজ দশরথের তনয় রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য অরণ্যে নির্ব্বাসিত হন। এই সময়ে রামচন্দ্র প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতার সহিত দক্ষিণাপথে যাইয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করেন। লঙ্কার অধিপতি দুর্ব্বৃত্ত রাবণ সীতাকে এই স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কায় যাইয়া, ভার্য্যার উদ্ধার সাধন করেন। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে রাবণ প্রায় সবংশে নিহত হয়। ইহাই রামায়ণের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। বাল্মীকি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাল্মীকি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট। অনেকে বলেন, তিনি রামচন্দ্রের সময়ের লোক। তৎপ্রণীত রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচারিত হয়।

মহাভারত।—কালক্রমে সূর্য্যবংশের অধঃপতন হইলে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হয়। এই চন্দ্রবংশীয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। পণ্ডিতদিগের মতানুসারে এই যুদ্ধ খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। দুর্য্যোধনাদির পরামর্শে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হওয়াতে চারি ভ্রাতা, মাতা ও বনিতার সহিত নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসনের নিয়মিত কাল অতীত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা

দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদের রাজ্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু দুর্য্যোধন দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত কিছুই দিতে সম্মত হন না। সুতরাং উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে শেষে যুধিষ্ঠির জয়ী হন। কিন্তু যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্য ভোগ করেন নাই; জ্ঞাতিগণের নিধনে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; এ জন্য তিনি অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য-ভার দিয়া পঞ্চ ভ্রাতা ও প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করেন।

**রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা।**—রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হয় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যে সমস্ত সৈন্য লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তৎসমুদয় রামায়ণে বানর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, দক্ষিণাপথে আদিম অসভ্য জাতির সংখ্যাই অধিক ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। কান্যকুব্জে দ্রুপদবংশীয়গণ, বিহারে জরাসন্ধ, মৎস্য প্রদেশে বিরাট, ভাগলপুরে কর্ণ, মথুরায় যদুবংশীয়গণ এবং মদ্রে শল্য প্রভৃতি মহারথ আর্য্যগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং যে সময়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সে সময়ে কান্দাহার ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বিহারের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি ছিল।

এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। ব্রাহ্মণগণ এ সময়ে আপনাদের প্রাধান্ত ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শূদ্রগণের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছিল। রাজ্যশাসন ও রাজধর্ম্মের অবস্থারও অনেকাংশে উৎকর্ষ হইয়াছিল। রাজারা যথানিয়মে রাজ্য-শাসন না করিলে পতিত হইতেন। তাঁহাদিগকে সাধারণ মত মানিয়া চলিতে হইত। প্রজারা সৌরাজ্য-সুখ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিত। এ সময়ে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই কার্য্য কেবল বৃষ্টির অপেক্ষায় ফেলিয়া রাখা হইত না। কৃষি-ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কূপ ও খাল প্রভৃতি খনন করা হইত। এই কূপ ও খাল সকলের জলে ক্ষেত্র-সমূহ উর্ব্বর হইয়া প্রচুর শস্য-সম্পত্তি প্রদান করিত। কোন প্রজা আপনার ভরণপোষণে একান্ত অসমর্থ হইলে রাজা তাহাকে আবশ্যক মত ঋণ দিতেন। প্রজাদের ধন, প্রাণ ও অন্তঃশত্রু হইতে রাজ্য নিরাপদ রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রহরী ও শান্তি-রক্ষক নিয়োজিত থাকিত। রাজা বিদ্রোহের আশঙ্কায় সৈন্যদিগকে বেতন দিয়া বশীভূত রাখিতেন। যখন তিনি সুযোগ বুঝিতেন, তখন ঐ সমস্ত সৈন্য লইয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইতেন। শরৎকালই দিগ্‌বিজয় যাত্রার উপযুক্ত সময় ছিল।

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয়স্থলেই যুদ্ধ-কুশল জাতির বসতি ছিল। ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। সূর্য্যবংশীয় রাজা রঘু যখন দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন, তখন প্রায় সকল স্থলেই তাঁহাকে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কেহ অবলীলায় বা অসঙ্কোচে আপনাদের স্বাধীনতা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করে নাই।

মহাভারতের সময়ে যজ্ঞ প্রভৃতিতে বিশেষ আড়ম্বর হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় পঞ্চ ভ্রাতা ও মাতার সহিত হস্তিনাপুর হইতে বারণাবতে (বর্ত্তমান এলাহাবাদে) গেলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে জতুগৃহে ভস্মীভূত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ইহা জানিতে পারিয়া পলায়নপূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দ্রুপদ-রাজ্যে উপনীত হন। এই স্থানে দ্রৌপদীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। অতঃপর তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বাস করেন। এইসময়ে যুধিষ্ঠির সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার প্রাধান্য রক্ষার জন্য রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। এই মহাযজ্ঞে আড়ম্বরের একশেষ হয়। চতুরঙ্গ সৈন্য চারি দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্যাধিপতিকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনিবার জন্য দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করে। যুদ্ধ-কুশল অর্জ্জুন উত্তর-বাহিনী, মহাবল ভীমসেন পূর্ব্ব-বাহিনী, মহারথ নকুল পশ্চিম-বাহিনী ও শস্ত্র-পারদর্শী সহদেব দক্ষিণ-বাহিনী সেনার অধিনায়কতা গ্রহণ করেন। ইহাদের পরাক্রমে সমুদয় স্থলেই যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করেন।

এই যজ্ঞে সমস্ত আর্য্য নৃপতিই আহূত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার "ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী" উপাধি গ্রহণের সময়ে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি, দিল্লীতে যে মহাসমৃদ্ধ দরবার হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে তাহা অপেক্ষা অল্প আড়ম্বর বা সমারোহ হয় নাই।

**মনুসংহিতা।**—রামায়ণ ও মহাভারতের পর মনু-সংহিতার নাম উল্লেখ করিতে হয়। হিন্দু আর্য্যদিগের সামাজিক আচারব্যবহারের বিবরণ মনুসংহিতায় সবিস্তর বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে মনুকর্তৃক এই সংহিতা সঙ্কলিত হয়। ক্ষত্রিয়-বংশে মনুর উৎপত্তি। তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। মনু ক্ষত্রিয়-তনয় হইলেও অসঙ্কুচিতভাবে সকল জাতির সম্বন্ধেই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতার সময় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের ক্ষমতা ও রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত নিয়ম কিরূপ ছিল, তাহা এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

**ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।**—ব্রাহ্মণকে প্রথম অবস্থায় ছাত্রত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বদা সংযত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন, এবং সংযত হইয়া শিক্ষাদাতা গুরুর আদেশ প্রতিপালনে তৎপর থাকিবেন। তাঁহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বদা বিনয়ী, নম্র ও কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল থাকিবেন। এই প্রথম অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য। যথাবিধি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। গৃহস্থ-ধর্ম্মে প্রথম প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণ "স্নাতক" নামে উক্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ যথানিয়মে বিবাহ করিয়া, শিক্ষাদান ও যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর নিকটে ব্রাহ্মণ যে দান গ্রহণ করিবেন, তাহাতেই তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যখন ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার নির্দ্দিষ্ট উপায় রহিত

হইবে, তখন তিনি সৎপথে থাকিয়া কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত-চিত্ত হইয়া শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রীয় কার্য্যানুষ্ঠানে আসক্ত থাকিবেন। তিনি সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বরশূন্য আহারীয় ও পরিচ্ছদে পরিতুষ্ট থাকিবেন। গৃহস্থাশ্রমের পর ব্রাহ্মণকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আপনার ধর্ম্ম-জীবনের এই তৃতীয় অবস্থায় আরণ্য আশ্রমে বাস করিয়া, ঈশ্বরের উপাসনায় ও ঐশ্বরিক তত্ত্ব-চিন্তায় কালাতিপাত করিবেন। ইহার পর তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি এই অবস্থায় সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া মঙ্গলময় পরব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিবেন। ধর্ম্ম-জীবনের এই অবস্থা চতুষ্টয় যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাসাশ্রম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

**ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য।**—ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিবেন, যথাবিধানে প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকিবে। বেদাধ্যয়ন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

**বৈশ্যের কর্ত্তব্য।**—বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বেদাধ্যয়ন করিবেন। ইহা ভিন্ন পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে তাঁহার অধিকার থাকিবে। বৈশ্য পশু-চারণে দক্ষ হইবেন, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ থাকিবেন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত রাখিবেন।

**শূদ্রের কর্ত্তব্য**।—শূদ্র আর্য্যদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। বেদাধ্যয়নে, বা কোন প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপে তাহার ক্ষমতা থাকিবে না। সে অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে সামান্য রকম শিল্প-কার্য্য করিতে পারিবে।

**রাজ্য-শাসন**।—রাজার এই ধর্ম্ম ছিল যে, তিনি দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন করিবেন। কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, রাজ্য রক্ষা করিবেন। মিত্রের সহিত সদ্ব্যবহার, ও ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মণেরা যে উপদেশ দিবেন, তাহা শুনিবেন। তিনি ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হইবেন না, রাজ-কার্য্যে আলস্য করিবেন না, এবং ক্রোধের বশীভূত থাকিবেন না। রাজ-কার্য্যসম্পাদনার্থ সাত জন মন্ত্রী থাকিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রিত্ব করিতেন। অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে গুণী, জ্ঞানী, কর্ম্মদক্ষ, দেশকালাভিজ্ঞ, সাহসী, দূরদর্শী ও মিষ্টভাষী এক ব্যক্তি থাকিতেন, ইঁহার উপাধি দূত। ইনি ভিন্ন দেশসংক্রান্ত রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

**পল্লীসমাজ**।—গ্রামের কার্য্য গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইঁহারা কেহ দশ, কেহ শত, কেহ সহস্র গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের উপর এক এক জন অধ্যক্ষ থাকিতেন। এই প্রকারে পল্লী-সমাজের সৃষ্টি হয়।

রাজা স্বয়ং এই সকল গ্রামের প্রধান ও অধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহাদের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ দুইখানি লাঙ্গলে যে পরিমাণের ভূমির চাষ হইতে পারে, তাহা পাইবেন। শত গ্রামের অধ্যক্ষ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের

ভূমি ভোগ করিবেন, এবং সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষ একখানি বৃহৎ গ্রামের ভূমি পাইবেন। ইহা ভিন্ন দেশের এক এক ভাগে সেনা থাকিত, এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন সেনাপতি থাকিতেন। ইহারা সর্ব্বদা শত্রু-চক্র হইতে দেশ রক্ষা করিতেন।

রাজস্ব।—রাজস্বগ্রহণের এই নিয়ম ছিল, ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহার ব্যয় বিবেচনা করিয়া রাজা কোন স্থলে দ্বাদশ অংশ, কোন স্থলে অষ্টম অংশ, এবং কোন স্থলে ষষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিবেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদির পঞ্চাশৎ অংশের একাংশ, যুদ্ধসময়ে পঞ্চমাংশ লইবেন। সুগন্ধ দ্রব্যাদির ষষ্ঠাংশ পাইবেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের লভ্য বিবেচনা করিয়া রাজা তাহার পঞ্চমাংশের একাংশ লইবেন। কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কোন অস্বামিক দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তিনি এই বলিয়া ঘোষণা করিতেন যে, দ্রব্যের অধিস্বামী তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা লইয়া যাইবে। অধিস্বামী নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপস্থিত না হইলে ঐ দ্রব্য রাজ-সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। খনি হইতে যে ধাতু পাওয়া যাইত, ভূস্বামী তাহার অর্দ্ধেক পাইতেন।

ব্রাহ্মণের ক্ষমতা।—ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণদের কখনও অবমাননা হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ অন্য উপায়ে আপনাদের প্রাধান্য অপ্রতিহত ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রণয়ন ও নিয়মব্যবস্থাপনের ক্ষমতা আপনাদের হস্তে রাখিলেন। ব্রাহ্ম-

ণেরা সন্ধি-বিগ্রহের মন্ত্রণাদাতা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরামর্শ-দাতা ও সমুদয় সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন। কোন কার্য্য তাঁহাদের অমতে সম্পন্ন হইতে পারিত না, এবং কোন নিয়ম তাঁহাদের বিনা সম্মতিতে বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। কেহ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে বা কেহ তাঁহাদের অনুমোদিত নিয়মে অনাস্থা দেখাইলে, তাঁহারা তাহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেন, এবং অন্তিমে অনন্ত সুখের পরিবর্ত্তে ঘোর অন্ধকারময় নরকভোগের ভয় দেখাইতেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত ও ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মানুশাসনের প্রতি সে সময়ে সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। কেহ এই চিরন্তন অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না এবং কেহ এই চিরন্তন অনুশাসনের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে অপরকে প্রবর্ত্তিত করিত না। কেহ এই ব্যবহার-পদ্ধতির বিরোধী হইলে সকলে তাহাকে অধঃপতিত ও প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিত। এইরূপে প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগকের ক্ষমতা ও আধিপত্য বদ্ধমূল হইল, এইরূপে দেবতাস্থানীয় হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ "ভূদেব" বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন।

অপরাপর জাতির উন্নতি।—ব্রাহ্মণের অসীম ক্ষমতায় মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আপনার সাধনা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা-বলে ব্রাহ্মণত্ব পাইলেন। মিথিলার অধিপতি জনক প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া রাজর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার আশায় তাঁহার শিষ্য হইতেও সঙ্কুচিত হইলেন না।• ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডে যেমন আড়ম্বর করিয়া

আসিতেছিলেন, ক্ষত্রিয়েরা তেমন উপনিষদে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরমার্থজ্ঞানে আপনাদের দুরদর্শিতা ও চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ক্রমে হিন্দু-সমাজে অধিকতর উদারতা দেখা যাইতে লাগিল। সাধুতার উপর হিন্দু আর্য্যদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুতা হইতে স্খলিত হইলে শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইতেন। শূদ্র সাধুতা দেখাইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানের সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন অসবর্ণ বিবাহ, আর্য্য-জাতির আচারব্যবহারের অনুকরণ ও আর্য্য-সমাজের সহিত সংমিশ্রণেও নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপে অপরাপর জাতির উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয়।

ব্রাহ্মণের পুনর্ব্বার প্রাধান্য-লাভ।—খ্রীঃ অব্দের এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু আর্য্যদিগের অবস্থা এই রূপ ছিল। ইহার পর ব্রাহ্মণেরা আবার প্রাধান্য লাভ করেন। উপনিষদের পরে স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির সময়ে ব্রাহ্মণেরা অপ্রতি-হত ভাবে আপনাদের ক্ষমতা চালনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবনতি।—ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য চিরকাল এক ভাবে রাখিতে পারেন নাই, চিরকাল তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম ভারতবর্ষে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। কিছুকালের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এক মহামনস্বী প্রাদু-র্ভূত হইলেন এবং সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম পরাজয় করিয়া তুলিলেন। এই মহামনস্বীর নাম শাক্যসিংহ বা গৌতম, তৎ-প্রচারিত ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

( খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩—খ্রীঃ ১০০০ অব্দ )

শাক্যসিংহের জীবনী।—শাক্যসিংহ বা গৌতম বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন বারাণসীর প্রায় একশত মাইল উত্তরে বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তঃপাতী একটি জনপদের রাজা ছিলেন। কপিলবস্তু নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। শাক্যসিংহ কপিলবস্তুতে জন্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ কহেন, এখনকার গোরক্ষপুর জেলার নগরখাস নামক পল্লী শুদ্ধোদনের প্রাচীন রাজধানী কপিলবস্তু।

শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। শাক্যকুলে ও গৌতম বংশে জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম শাক্যসিংহ ও গৌতম হয়। শাক্য-সিংহের অর্থ, শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, তাঁহার আর এক নাম সিদ্ধার্থ ছিল। সিদ্ধার্থ শব্দের অর্থ, যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শাক্যসিংহ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী।

শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলেও শাক্যসিংহকে কোন

কষ্টে পড়িতে হয় নাই। শুদ্ধোদন, তনয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আর এক মহিষীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই মহিষী, শাক্যসিংহের মাতার ভগিনী। শুদ্ধোদন, মায়া দেবীর জীবদ্দশাতেই ইঁহাকে বিবাহ করেন।

শাক্যসিংহ দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও বড় তীক্ষ্ণ ছিল। বাল্যকালেই তিনি চিন্তাপরায়ণ হইয়া উঠেন। সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী অরণ্যের ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া, সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয় না। কিছুদিন পরে গোপা নামে একটি পরমসুন্দরী কন্যার সহিত শাক্যসিংহের বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও শাক্যসিংহ পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে সংসারে বিরক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

শাক্যসিংহ রাত্রিকালে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে সমস্ত রাত্রি গমন করেন। এক জন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার সঙ্গে ছিল। শাক্যসিংহ এক স্থানে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে নামিলেন, এবং অনুচরকে পোষাক ও আপনার সমস্ত অলঙ্কার দিয়া কপিলবস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন। যে স্থানে শাক্যসিংহ তাঁহার অনুচরকে বিদায় দেন, সেই স্থানে একটি স্মরণ-স্তম্ভ বর্ত্তমান ছিল। চীনদেশের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হিউএন্ থ্সঙ্ কুশী নগরে যাইবার পথে, একটি বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তভাগে এই স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। কুশী নগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে উহা ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

শাক্যসিংহ প্রথমে বৈশালী (বর্ত্তমান বিশার, গণ্ডক নদের পূর্ব্ববর্ত্তী) নগরীতে যাইয়া এক জন ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহার পর বিহারের রাজধানী রাজগৃহে (আধুনিক রাজগির) আর এক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হন। অনন্তর ধর্ম্মচিন্তায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া, "বুদ্ধ" নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

বুদ্ধ কিছুকাল বারাণসীতে থাকিয়া মগধ-রাজ বিম্বসারের অনুরোধে রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষে বিম্বসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বুদ্ধ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন অযোধ্যার রাজধানী শ্রাবস্তীতে (রাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী সাহেতমাহেত) উপনীত হন। ইহার পর তিনি কপিলবস্তুতে যাইয়া স্ববংশের সমুদয় ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধ রাজগৃহে উপনীত হইলে অজাতশত্রু তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

বুদ্ধ ইহার পর শিষ্যগণের সহিত কুশী নগরে যাইতেছিলেন, পথে উদরাময় রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি এক অরণ্যে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন; এই স্থানেই একটি শাল বৃক্ষের নীচে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইল। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

**বুদ্ধের মত।**—বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল। বুদ্ধ কহেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনুষ্যের দুঃখের কারণ। সমাধি-বলে এই সকল রিপুকে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই পরিণামে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। সর্ব্ব-

জীবের প্রতি দয়া, সত্য-নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অহিংসা, এই ধর্ম্মের সার। বুদ্ধ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তিনি সমুদয় জাতির, সমুদয় বর্ণের লোককেই আপনার ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ যে বৈষম্য-প্রণালী স্থাপন করেন বুদ্ধ তাহা উচ্ছেদ করিয়া সাম্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার।—ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শীঘ্রই বদ্ধমূল ও বহুলপ্রচার হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ এত দিন সমুদয় প্রধান প্রধান কার্য্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা আর কাহাকেও উহা করিতে দিতেন না। ইহার পর বুদ্ধ যখন ঘোষণা করিলেন, সকলেই সমান, সকলেই সমানরূপে সমুদয় কার্য্য করিবার অধিকারী. তখন লোক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দলে দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল; উহা ভারতবর্ষ ও লঙ্কা হইতে জাপান পর্য্যন্ত এবং তিব্বত হইতে চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

## ভারতবর্ষে পারশীক ও গ্রীক অধিকার।

পারশীকদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশ।— বুদ্ধের জীবদ্দশায় পারশ্যের অধিপতি দরায়ুস হিস্তাস্পেস সিন্ধু নদ পার হইয়া কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন (৫২১ খ্রীঃ পূঃ)। এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় অধিকার হইতে দরায়ুস যে কর আদায় করিতেন, তাহা তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের সমুদয় রাজস্বের তিন ভাগের এক ভাগ হইবে। ইহাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষে তাঁহার অধিকার বড় কম ছিলনা।

সেকন্দর শাহের আক্রমণ, ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ।— ইহার পর গ্রীশরাজ্যের অন্তঃপাতী মাকিদনের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বাল্যকাল হইতেই সেকন্দর শুনিয়াছিলেন, সিন্ধু নদের পারে যে দেশ আছে, তাহা অতি অদ্ভুত। এই অদ্ভুত দেশ দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পারশ্য রাজ্য জয় করিয়া ক্রমে পঞ্জাবে উপস্থিত হন। পুরু নামে এক জন প্রতাপান্বিত রাজা পঞ্জাবের এক স্থানে আধিপত্য করিতেন। তিনি বহুসংখ্য সৈন্য, হস্তী ও যুদ্ধ-রথ লইয়া সেকন্দরের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হন। চিলিয়ানবালার ১৪ মাইল পশ্চিমে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে পুরুর পরাজয় হয়, তাঁহার দুই পুত্র রণশায়ী হন। সেকন্দর শাহ পুরুর অসামান্য পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশল দেখিয়া তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ স্থাপন করেন। ইহাতে সেকন্দরের সহিত পুরুর বন্ধুতা জন্মে। সেকন্দর শাহ পঞ্জাবের মালব ও ক্ষুদ্রক নামক দুইটি যুদ্ধ-প্রিয় জাতিকে বশীভূত করেন।

ইহার পর সেকন্দর চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী অতিক্রম পূর্ব্বক বিপাশার তটে আসিয়া মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ রণ-শ্রম ও পথ-ক্লেশে এতদূর পীড়িত হইয়াছিল যে, তাহারা কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। সেকন্দর অগত্যা এই স্থান হইতে তাঁহার অধিকৃত পারশ্যে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কিয়দংশ সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্তানের মরুভূমি দিয়া চলিলেন; অবশিষ্ট সৈন্য নিয়র্কসের অধীনে সিন্ধু নদের মোহানা হইতে সমুদ্র-পথে যাত্রা করিল।

## মগধ সাম্রাজ্য।

মগধের বর্ত্তমান নাম বিহার। পাটলীপুত্র ( পাটনা ) ইহার রাজধানী। ইতিহাসে এই প্রদেশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে রাজর্ষি জনকের আবাস ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিখিতে আসিতেন। এই স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা আর্য্যভট্ট আবির্ভূত হন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। এই স্থানের নৃপতিগণ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং এই স্থানে গুরু গোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখদিগের মধ্যে রাজনৈতিক সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন করেন।

নন্দবংশ।—খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে নন্দবংশীয় নয় জন শূদ্র রাজা ক্রমান্বয়ে মগধে রাজত্ব করেন। পরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া স্বয়ং রাজা হন।

**চন্দ্রগুপ্ত, খ্রীঃ পূঃ ৩১৫-২৯১।**—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয়। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীন করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্ত ( তমোলুক ) পর্য্যন্ত তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মগধসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বতন রাজারা পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেই আপনাকে "মহারাজ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ অধিকার করিয়া ঐ গৌরবসূচক উপাধি লাভ করেন। যে শূদ্রদিগকে ব্রাহ্মণগণ দাস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই এক্ষণে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইয়া উঠিলেন।

**সেলুকস্**—সেকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ্য তদীয় সেনাপতিগণ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। পারস্য রাজ্য সেলুকস্ নামক এক জন সেনাপতির হস্তে পড়ে। সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিবার জন্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আইসেন। কিন্তু যুদ্ধে সেলুকস্ পরাজিত হন। শেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকস্‌কে আদরসহকারে গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দেন। সেলুকস্‌ও পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকারেব সহিত আপনার প্রিয়তমা দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর বিবাহ হয়। সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিসকে দূত স্বরূপ রাখিয়া স্বরাজ্যে গমন করেন। এই মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বিন্দুসার, খ্রীঃ পূঃ ২৯১-২৬৩।—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিন্দুসার, পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে বিন্দুসার স্বীয় পুত্র অশোককে তথায় প্রেরণ করিলেন। অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হইলেন। ইহার মধ্যে বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম পাটলীপুত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া অশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন।

ক্রমে বিন্দুসারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। বিন্দুসার অন্তিম

কালে অমাত্যের পরামর্শে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ অমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন।

**অশোক, খ্রীঃ পূঃ ২৬৩-২৩৩।**—পিতার পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদে সুসীম তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাঁহার কার্য্য-কুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ এক সময় পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, মালব হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অশোকের মাতার নাম সুভদ্রাঙ্গী। কথিত আছে, পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশোক নামে অভিহিত হয়। অশোক অতি কদাকার ছিলেন। আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর ছিল। এ জন্য অশোক "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অশোক আপনার এই "চণ্ড" নাম সার্থক করিয়া তুলিলেন। তিনি ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আশঙ্কায় স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলেন। এইরূপ আরও অনেক কার্য্যে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কয়েকটি কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোক বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই অপরাধ বড় গুরুতর মনে করিয়া,

তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামক এক জন নরহন্তাকে আদেশ করিলেন। নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোর-প্রকৃতি প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

রাজ্য-প্রাপ্তির কিছু দিন পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকের ধর্ম্মগুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-তত্ত্বে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, সৎপথে আনিলেন। অশোক এই রূপে গুরুর সহবাসে ও গুরুর উপদেশে ধর্ম্ম-নিরত ও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে ধর্ম্মাচরণে, ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় অশোকের প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। তিনি নানা স্থানে মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সকল ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হইল; অশোক ধর্ম্মাশোক ও প্রিয়দর্শী নামে সাধারণের নিকটে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

তক্ষশিলার বিদ্রোহ এ পর্য্যন্ত নিবারিত না হওয়াতে অশোক স্বীয় পুত্র কুণালকে বিদ্রোহ নিবারণার্থ তথায় প্রেরণ করেন।

**বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি।**—অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। অশোক অনেক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ইহাতে মহারাষ্ট্র হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া উঠে। অশোকের রাজত্বে বৌদ্ধদিগের একটি মহতী সভা হয়। নানা স্থান হইতে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ এই

সভায় সমাগত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক সমস্ত মতামতের নির্দ্ধারণ করেন।

**সৎকার্য্য।**—অশোক অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সাধারণকে নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে নীতিপরায়ণ লোকদিগকে প্রেরণ করিতেন। যদিও তিনি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি কখনও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ. উভয়েরই সমান আদর ছিল। তিনি কখনও যুদ্ধে পরাজিত লোকদিগকে নিহত বা দাস করিতেন না, এবং বলপূর্ব্বক কাহাকেও নিজধর্ম্মে আনিতেন না। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যে পথের প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে কূপ খনন ও স্থানে স্থানে পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থ ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।

**অশোকের মৃত্যু ও রাজ্য-ভাগ।**—অশোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রেরা তদীয় সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুণাল পঞ্জাবের রাজা হন। দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কাশ্মীর রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিব-পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এক্ষণে অশোকের ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তর-খোদিত অনুশাসন-সমূহ অনেক পাওয়া গিয়াছে।

**মৌর্য্য বংশের লোপ।**—ইহার পরে মৌর্য্যবংশীয় আর ছয় জন নৃপতি যথাক্রমে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ রাজার নাম বৃহদ্রথ। পুষ্পমিত্র নামে বৃহদ্রথের এক জন সেনাপতি স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া রাজ্যে-

শ্বর হন। ইহারা শুঙ্গবংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র রাজার সমকালে পাণিনির ব্যাকরণের বিখ্যাত ভাষ্যকার পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন। শুঙ্গবংশের পরে পাটলীপুত্রের সিংহাসন ক্রমান্বয়ে কণ্ব ও অন্ধ্র বংশীয়ের অধিকৃত হয়। ইহারাও পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি।—অশোকের পর হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতে থাকে। হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বৌদ্ধেরা যেমন নানা স্থানে আপনাদের ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, হিন্দুরাও তেমন আপনাদের ধর্ম্ম-কাহিনী নানা স্থানে কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান; এইরূপে কথকতার সৃষ্টি হয়। এই কথকতায় হিন্দুদের অনেক লাভ হইয়াছিল। অনেকেই উহা শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতে থাকে। হিন্দুদের আর একটি সুবিধা ছিল, হিন্দু-সমাজে থাকিয়া, সকলেই আপনাদের রুচি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত। কেহ দেবদেবীর পূজা করিত, কেহ একেশ্বরের উপাসনা করিত, কেহ ব্রাহ্মণের ও স্বশ্রেণীর অন্ন ভিন্ন আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিত না, কেহ বা ইচ্ছানুসারে সকলের অন্নই গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এ সুবিধা বৌদ্ধ ধর্ম্মে ছিল না। বৌদ্ধদিগের সকলকেই ঈশ্বর না মানিয়া স্বর্গীয় সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইত। সুতরাং বৌদ্ধগণ সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু বৌদ্ধেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল রহিল। এই সকল

কারণে হিন্দুগণই আবার বৌদ্ধদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন।

জৈন ধর্ম্ম।—বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময়ে মহাবীর নামক এক ব্যক্তি জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন। জৈন ধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। মূল বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে।

গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণ।—মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতির লিখিত বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের সমকালে ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক অবগত হওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা-অনুসারে পাটলীপুত্র নগর গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। উহা দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চারিদিকে ৪০০ হাত বিস্তৃত ও ৩০ হাত গভীর এক গড় ছিল। প্রাচীরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি বুরুজ শোভা পাইত।

পূর্ব্বতন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উপর যেমন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার ছিল, এ সময়েও তাহাই ছিল। কেবল শূদ্রের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল; ইহারা কৃষি-কার্য্যাদি করিত।

দেশের অধিকাংশ লোক কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা ধীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদিগকে অন্য কাজ করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এরূপ দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, তাহার নিকটেই কৃষকগণ অবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। সৈন্যেরা ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। রাজাই সমস্ত ভূমির অধিস্বামী ছিলেন, কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যাদির এক-চতুর্থাংশ পাইত।

রাজকীয় কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্ম্মচারিগণের এক এক শ্রেণী এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। কোন শ্রেণী শস্যাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, কোন শ্রেণী পূর্ত্তকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন, কোন শ্রেণী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-বিধানে যত্নপর হইতেন, এবং কোন শ্রেণী বৈদেশিক অতিথিদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। এইরূপে সমুদয় কার্য্যই সুনিয়মে সম্পাদিত হইত।

দেশের লোক মিতাচারী ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভিন্ন মদ্য পান করিত না। সত্য ও ধর্ম্মের সম্মান করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে ইহারা থাকিত না। কদাচিৎ মামলা মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হইত। ইহারা প্রায়ই কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। দণ্ডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্তপদাদি ছেদন করা হইত। পল্লীসমাজ * প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

যুদ্ধ ও বিচার-কার্য্যের সময়ে রাজা আপন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন। তিনি দিবসে নিদ্রা যাইতেন না; বিচার-গৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন বিচার করিতেন। তাঁহার দেহরক্ষার ভার মহিলাদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে

* গ্রামের মণ্ডল পল্লী-সমাজের অধিপতি। তিনি আপনার অধিকারমধ্যে শান্তিরক্ষণ, বিবাদভঞ্জন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী। যদি কেহ উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার সম্পত্তি রাজার অধিকারভুক্ত না হইয়া পল্লীসমাজের অধিকারভুক্ত হয়।

সজ্জিত হইয়া আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রাজা যখন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন, তখন এই রমণীদল অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কেহ রথে, কেহ অশ্বে ও কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া যাইত*। রাজা হস্তীতে যাইতেন।

বক্ত্রীয় গ্রীক।—এশিয়াস্থিত গ্রীক সাম্রাজ্যের যে অংশ আফ্‌গানিস্তানের উত্তরে, তাহার নাম বাক্ত্রিয়া। এক্ষণে উহা "বল্‌খ্‌" নামে পরিচিত। সেলুকসের পর বাক্ত্রিয়ার গ্রীক শাসন-কর্ত্তারা "রাজা" উপাধি ধারণ করেন। ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

## হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

পুরাণে লিখিত আছে, ঋষিগণ বিধর্ম্মীদিগের অত্যাচারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে পরশুরাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয়-কুল পুনঃসৃষ্টি করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে ঋষিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে জল প্রক্ষেপ করাতে চারি জন মহাবীর সমুত্থিত হন। ইহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধদিগকে নিহত ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বীরপুরুষগণ অগ্নিকুল নামে প্রসিদ্ধ। অনেক রাজপুত ইহাদিগকে আদি-পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই গল্পটি যে কল্পনামূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতায় বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য

* শ্যামদেশে এ প্রণালী প্রচলিত আছে। তথাকার ললনাগণ রাজার দেহ রক্ষা করিয়া থাকে।

বিলুপ্ত হইয়া আইসে। এই জন্য বোধ হয়, এই গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ন্যূন হইলেও খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

বিক্রমাদিত্য।—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এই উন্নতির সময়ে ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের শাসিত উজ্জয়িনী রাজ্য সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে। অগ্নিকুলের প্রমরবংশে বিক্রমাদিত্যের উদ্ভব হয়। ইনি বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ইহার সভায় অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। কালিদাস এই সময়ে আপনার অলৌকিক কবিত্ব বিকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করেন। এক্ষণে যে সংবৎ প্রচলিত আছে, তাহা বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দ হইতে উহার আরম্ভ হয়। "শক" নামে একটি অসভ্য জাতিকে পরাজিত করাতে বিক্রমাদিত্য "শকারি" নামে বিখ্যাত হন।

আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরাজ্য।—উত্তর ভারতবর্ষে কান্যকুব্জ, মিবার, মাড়বার, অজমীঢ় প্রভৃতি ক্রমে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এ দিকে গুজরাটের বল্লভী নগরীতে সূর্য্যবংশীয় কনকসেনের বংশধরগণ, বাঙ্গালায় পালবংশীয়গণ (ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন) এবং উড়িষ্যায় কেশরীবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। পালবংশের পর সেনবংশীয় রাজারা বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন; কেশরীবংশের পর গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণ উড়িষ্যার অধিপতি হন।

**দক্ষিণাপথের রাজ্য।**—দক্ষিণাপথেও অনেকগুলি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। তন্মধ্যে মদুরায় পাণ্ড্যবংশ, আদৌ কাঞ্চীপুরের পশ্চাৎ তাঞ্জোরের চোলবংশ, মহীশূরের উত্তরবর্ত্তী দ্বারসমুদ্রের চেরবংশ অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল।

**শালিবাহন।**—শালিবাহন নামে এক জন রাজা মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রতীষ্ঠানপুরীতে (বর্ত্তমান পাটন, গোদাবরীর তীরবর্ত্তী) আধিপত্য করিতেন। শালিবাহনের শকাব্দা খ্রীঃ ৭৭ অব্দে প্রচলিত হয়। শালিবাহন এক জন বিচক্ষণ গ্রন্থকারছিলেন।

**কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।**—কুমারিল ভট্ট মৈথিল ব্রাহ্মণ। অনুমান খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কুমারিল যুক্তি ও কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে অভ্যুত্থিত হন। ইহার পর মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শঙ্করাচার্য্য মলবারের নাম্বুরী জাতীয় ব্রাহ্মণ। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বেদান্তের মত স্থাপন করেন।

**বিদ্যা ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগের উন্নতি।**—প্রাচীন সময় হইতে মুসলমানদের আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস এইরূপ অস্পষ্ট ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যাহা হউক, মুসলমানদিগের রাজত্বের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, হিন্দুগণ, বিদ্যা ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, একবার তাহার আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

**হিন্দুদিগের শাস্ত্রজ্ঞান।**—শাস্ত্রজ্ঞানে হিন্দুরা সকল জাতির অগ্রগণ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের শাস্ত্রজ্ঞানই ইউরোপে

যাইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পণ্ডিত ও ক্রমে দূরদর্শী করিয়া তুলে। পাণিনির ব্যাকরণ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কালক্রমে কাত্যায়ন এই ব্যাকরণের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলি ইহার ভাষ্য লিখেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গতি নিরূপণ করেন। পৃথিবী যে সচলা, তাহা পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের বিদিত ছিল। গণিত-শাস্ত্রেও হিন্দুরা বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রধান গণিত-শাস্ত্র লেখক। দশ গুণোত্তর অঙ্কসংখ্যা হিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত। এতদ্ব্যতীত হিন্দুগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বীজগণিতের অনেক সঙ্কেত প্রকাশ করেন। আরবগণ প্রথমে হিন্দুদিগের নিকট গণিত-শাস্ত্র শিক্ষা করে। ইউরোপীয়গণ আরবী গ্রন্থ পাঠ করিয়া আবার উহা স্বদেশে প্রচার করেন। দর্শন-শাস্ত্রেও হিন্দুগণ প্রবীণ ছিলেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা, এই ষড়্দর্শনে হিন্দুদের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যে হিন্দুদের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। কালিদাসের প্রণীত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুবাদমাত্র পাঠ করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত মোহিত হইয়াছেন। কালিদাসের প্রণীত ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, ভবভূতির বীরচরিত, উত্তর রামচরিত ও মালতীমাধব নাটক প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে হিন্দুগণ অপ্রবীণ ছিলেন না। সুশ্রুত ও চরকের গ্রন্থে রোগের নিদান, তাহার চিকিৎসা ও অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুন্দররূপে লিখিত আছে।

শিল্পকার্য্য।—এক্ষণে স্থানে স্থানে যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা খোদাইকার্য্যে যেমন পটু ছিলেন, চিত্র-বিদ্যায় তেমন ছিলেন না। প্রসিদ্ধ ইলোরা ও এলিফাণ্টার গুহা হিন্দুদের খোদাই-কার্য্য নৈপুণ্যের প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল।

সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য। পূর্ব্বে হিন্দুরা সমুদ্র-পথে গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যাবা ও বালী দ্বীপ প্রভৃতিতে তাঁহারা গমনাগমন করিতেন। অনেক কাল পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে হিন্দু-বংশ ছিল। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, হিন্দুরা বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র অতিবাহন করিয়া অনেক দূরদেশে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, রোম প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দুদের গতিবিধি ছিল। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ রোমের সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিতেন।

আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিত। বরোচ একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। সিন্ধু নদের মোহনা দিয়া নৌকাসংযোগে অনেক বাণিজ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে প্রেরিত হইত; তাম্রলিপ্তও (তমোলুক) একটি প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া উঠে। সমুদ্র-যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, মসলিন,

রেসমী কাপড়, নীল প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ মসলা, চিনি, হীরা ও মুক্তা প্রভৃতি, এবং আমদানি মধ্যে পিত্তল, টিন্, সীসক, কাচ প্রভৃতি প্রধান ছিল।

রাস্তা।—বাণিজ্যের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ এই বিষয়ে অনেক উন্নতি করেন। সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল পাটলীপুত্র হইতে সিন্ধু ও বরোচ নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

ফা-হিয়ান ও হিউ এন্থসঙ্গ্।—চীন দেশের কতিপয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দুই জন বিখ্যাত পর্য্যটকের নাম ফা-হিয়ান, ও হিউ এন্থসঙ্গ্। প্রথমে ফা হিয়ান এ দেশে আইসেন। তাঁহার পরে হিউ এন্থসঙ্গ্ উপনীত হন। উভয়েই আপনাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষে আইসেন এবং ১৫ বৎসর থাকিয়া ৪১৪ অব্দে প্রতিগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ্ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে আসিয়া এ দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্ব্বক অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের অনেক কথা জানা যায়। হিউ এন্থ্সঙ্গের সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী রাজ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মগধ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উঠিয়া যায় নাই। নালন্দা নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এখানে ১০,০০০ বৌদ্ধ যতি বাস করিতেন। নালন্দা, বিহারের অন্তঃপাতী ও বর্ত্তমান রাজগির হইতে ৭ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। হিউ এন্থ্সঙ্গ্ ধর্ম্মতত্ত্ব

শিক্ষার নিমিত্ত নালন্দায় পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করেন। এক্ষণে নালন্দার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

---

## মুসলমানদিগের রাজত্ব।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সাতিশয় অস্পষ্ট। বৈদিক ও পৌরাণিক কালের ইতিহাস ভাল জানিতে পারা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের সময়ের ইতিগাসও ধারাবাহিক নয়। গ্রীক-দিগের সময়েও ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক স্থলে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মুসলমানেরা প্রবল বেগে ভারতবর্ষে উপনীত হয়, এবং ক্রমে প্রধান প্রধান রাজ্য হস্তগত করিয়া তুলে। মহম্মদ এই মুসলমান-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

মহম্মদের জীবনী।—মহম্মদ আরব দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরে ৫৭০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতা সুশি-ক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। মহম্মদ ২৫ বৎসর বয়সে খোদেজা নামে একটি সম্পত্তিশালিনী বিধবা মহি-লার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি আরবদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতির বন্ধন শিথিল ও পৌত্তলিকতার প্রাবল্য দেখিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ নির্জ্জনে থাকিয়া, মনো-যোগের সহিত ইহুদিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এই সময়েই

তিনি সাধারণ্যে প্রচার করিলেন, পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রেরিত। মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্ম-পুস্তকের নাম কোরাণ। প্রচলিত দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে মহম্মদকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে দেখিয়া, অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল, এবং অনেকে তাঁহার প্রাণ-সংহারেরও সঙ্কল্প করিল। মহম্মদ এ জন্য ভীত হইয়া ৬২০ খ্রীঃ অব্দে মদিনায় পলায়ন করিলেন। এই সময় হইতেই মুসলমানদিগের "হিজরী" শক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধুভাব ও বক্তৃতাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আরবদেশীয়েরা সাতিশয় সমরপ্রিয় ছিল। তাহারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিতে লাগিল। মহম্মদ খ্রীঃ ৬৩২ অব্দে লোকান্তরিত হন। তাঁহার জীবদ্দশায় প্রায় সমস্ত আরবে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

**মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচার।**—মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী ওমর খলিফা মদিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ওমর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রচার করিলেন, পৃথিবীতে সমস্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, কেবল মুসলমানধর্ম্ম মাত্র থাকিবে। আরবদেশীয় সমস্ত লোকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে বাহির হইল। তাহাদের প্রতাপে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজারা অবনত হইয়া পড়িলেন।

অদ্বিতীয় রোম রাজ্য এই সময়ে অসভ্য-জাতির দৌরাত্ম্যে বিধ্বস্ত ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কলহে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। পারস্য দেশীয় রাজারাও তাদৃশ বলশালী ছিলেন না, সুতরাং

কেহই মুসলমানদিগের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। মুসলমানেরা পারস্য দেশ অধিকার করিল, রোম-রাজ্যের অধীন সিরিয়ায় বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিল, আফ্‌রিকার অন্তর্গত রোমকদিগের অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিল, এবং স্পেন ও ফরাসী দেশ অধিকার-ভুক্ত করিয়া তুলিল। এইরূপে মহম্মদের মৃত্যুর পর এক শত বৎসরের মধ্যেই এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্‌রিকা মহাদ্বীপে মহা-প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইল। মহম্মদের শিষ্য-বর্গের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত বিজয়-পতাকা সর্ব্বত্র উড়িতে লাগিল। আরবের প্রতাপ সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

**মুসলমানকর্ত্তৃক দেশের উন্নতি।**—মুসলমানেরা বিজয়-ব্যাপারে উন্মত্ত হইলেও তাহাদিগকর্ত্তৃক দেশান্তরের অনেক উন্নতি হইযাছিল। ইউরোপে যে বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, আরবদেশীয় লোকই তাহার মূল। আরবগণ হিন্দুদিগের নিকটে উহা শিখিয়া স্বদেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। আরবদিগের নিকট ইউরোপীয়গণ প্রথমে উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরবের অনেকে সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। অনেক মুসলমান সম্রাটের সভায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বাস করিতেন। ইহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া দেশের অনেক উন্নতি করিয়াছিল। হারুণ-অলরশীদসম্রাট্ বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ইনি বাগ্‌দাদের আব্বাস বংশীয় পঞ্চম খলিফা ৮০৯ খ্রীঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

**ভারতবর্ষ আক্রমণ ও ধর্ম্ম-প্রচার।**—মুসলমানগণ

যখন নানাদেশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছিল, তখন যে, ভারতবর্ষ তাহাদের চক্ষে পতিত হইবে না, ইহা সম্ভব নহে। আরবেরা প্রথমে কাবুল রাজ্য আক্রমণ করে। ইহার পর আর একবার মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। পুনর্ব্বার আরবেরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। এই সময়ে আলি মদিনার খলিফীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। মুসলমানেরা ৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করে।

কিন্তু আরবেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও ধর্ম্ম-প্রচারে অন্যান্য দেশের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আরবে যেমন সহজে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, পারস্যে যেমন অবলীলায় উহা বদ্ধমূল হইয়াছিল, ভারতবর্ষে তেমন হয় নাই। পারস্যে ধর্ম্মের তাদৃশ মর্য্যাদা ছিল না। পুরোহিতগণ প্রায়ই নীচ-প্রকৃতি ও নীচাশয় ছিলেন, লোকের হৃদয় এই সমস্ত কারণে উত্তেজিত হইয়াছিল। এ জন্য আরবগণ যখন সুখময় স্বর্গরাজ্যের লোভ দেখাইয়া সকলকে একেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করিল, যখন সকলে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দলে দলে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপ শিথিল ছিল না। এখানে ধর্ম্মানুশাসন বদ্ধমূল ছিল। ধর্ম্ম-যাজকগণ সরল ও সুব্যবস্থিত ছিলেন। লোকে পুরুষানুগত ধর্ম্মানুশাসনের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইত। সুতরাং মুসলমানগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সর্ব্বত্র আপনাদের মত প্রচারে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

**কাসেম।**—যখন খলিফা অলিদ দামাস্কসের সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন *, তখন সিন্ধুদেশ মুসলমানদিগের পদানত হয়। সিন্ধুনদের তটে দেবাল নামে একটি পোতাধিষ্ঠান ছিল। এই স্থানে একখানি আরব দেশের জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। এ জন্য আরবের রাজকর্ম্মচারী বাসোরার অধ্যক্ষ সিন্ধুরাজকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অনুরোধ করেন। সিন্ধুরাজ উত্তর দেন যে, ঐ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত নহে, সুতরাং তিনি দায়ী হইতে পারেন না। ইহাতে বাসোরাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহম্মদ কাসেম নামে তাঁহার একটি বিংশতিবর্ষীয় ভ্রাতৃপুত্রকে ৬,০০০ সৈন্যের সহিত ঐ দেশ জয় করিত পাঠান (৭১১ খ্রীঃ অব্দ)। সিন্ধুর অধিপতি দাহির আসন্ন শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষে তিনি সমরে নিহত হন। ইহাতে অনেক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, রাজপুত্র তাত্তার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণাবাদে পলায়ন করেন। কিন্তু রাজ-রাণী শত্রুর নিকট অবনত হইলেন না। তিনি সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাসেম কিছু-তেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নগরে

* খলিফা আলির সময়ে খলিফীয় সিংহাসন দুই স্থানে ছিল। মহম্মদের প্রিয় শিষ্য মোবিয়া দামাস্কস্ নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক পারশস্থান প্রভৃতি অধীনে আনিয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। অপর দিকে আলি মদিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া আপনাকে মহম্মদের রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া প্রকাশ করেন। আরবেরা খলিফা আলির বশীভূত ছিল। কালক্রমে মোবিয়ার পৌত্র তৃতীয় মোবিয়া সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন হইলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মারোয়ানের বংশীয়েরা দামাস্কসে রাজত্ব করেন। অলিদ এই মারোয়ান বংশীয় তৃতীয় খলিফা।

আহার-সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। তখন রাণী উপায়ান্তর অভাবে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অনল-কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। সৈন্যগণ অসিহস্তে বাহির হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সমুদয় সিন্ধু কাসেমের পদানত হইয়া উঠিল।

**কাসেমের হত্যা।** খলিফা অলিদের আদেশে কাসেম নিহত হন (৭১৪) *। ইহাতে সিন্ধুদেশ আরবদিগের অধিকার-চ্যুত হয়। ইহার ৩০ বৎসর পরে একটি আরবকেও তথায় দেখা যায় নাই।

**খলিফাগণের অবনতি।** আরবেরা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল দেশ অধিকার করে, তাহার মধ্যে স্বাধীন তাতারের যার-পর-নাই উন্নতি হইয়াছিল। আরবদিগের আধিপত্যসময়ে এই প্রদেশের লোকেরা রাজনীতি ও কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং ক্রমে বাহুবলে রাজ্য জয় করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরিশেষে খলিফাদিগের রাজ্য পর্য্যন্ত ইহাদের প্রতাপ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত খলিফীয় রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িল। খলিফাগণ ক্রীড়াপুত্তল হইয়া দাঁড়াইলেন।

* মহম্মদ কাসেমের মৃত্যু-কাহিনী অদ্ভুত। কথিত আছে, কাসেম সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া রাজা দাহিরের দুইটি পরমসুন্দরী কন্যাকে খলিফা অলিদের নিকটে প্রেরণ করেন। ইহারা খলিফার নিকট সমানীত হইলে জ্যেষ্ঠা কন্যা কাতরভাবে কহে, কাসেম তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। ইহাতে খলিফা ক্রোধান্ধ হইয়া কাসেমের মৃত্যু দণ্ড, ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কাসেম নির্দ্দোষ ছিলেন। দাহিরের দুহিতা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ জন্য কাসেমের প্রতি অলীক দোষের আরোপ করিয়াছিল। এইরূপ অন্যায় বিচারে এক জন তরুণবয়স্ক বীর পুরুষের লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়।

**ইস্‌মাইল সামনী।** খলিফাগণ হীনবল হইলে বুখারা প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ইস্‌মাইল সামনী রাজপদবী গ্রহণ করিলেন। এই সামনীবংশীয়েরা প্রায় এক শত বৎসর উত্তমরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহাদের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিল। এই বংশের পঞ্চম রাজা আবদুল মালিকের আলপ্‌তুগীন নামে একটি ক্রীত দাস ছিল। আলপ্‌তুগীন ক্রমে প্রভুর প্রিয় পাত্র হইয়া খোরাসানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। পরিশেষে ইনি স্বয়ং রাজা হইয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার পূর্ব্বক গজনিতে রাজধানী স্থাপন করেন।

**সবক্তগীন।**—আলপ্‌তুগীন চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। আইজাক নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল। তিনি দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হন। আইজাক নিঃসন্তান ছিলেন। এ জন্য তাঁহার সৈন্যগণ আপনাদের সেনাপতি সবক্তগীনকে রাজা করিল। সবক্তগীন আলপ্‌তুগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপ্‌তুগীন ক্রমে তাঁহাকে সেনাপতি করেন। আলপ্‌তুগীনের মৃত্যুর পরে তিনি প্রভুর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

**ভারতবর্ষের রাজগণ।**—এই সময় হইতেই মুসলমানগণ ক্রমাগত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিল। এ সময়ে ভারতবর্ষীয় রাজগণের আধিপত্য কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। লাহোরে জয়পাল আধিপত্য করিতেছিলেন; উত্তরে হিন্দুকুশ, পশ্চিমে লাহোর, পূর্ব্বে কাশ্মীর ও দক্ষিণে মুলতান পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য ছিল। দিল্লীতে, তুয়ারবংশীয়

দিগের রাজত্ব ছিল। কান্যকুব্জে রাঠোরবংশীয়গণ আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিয়াছিলেন, উত্তরে পর্ব্বত-মালা, পূর্ব্বে কাশী, পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ড ও দক্ষিণে মিবার পর্য্যন্ত, ইহাদের প্রভুত্ব ছিল। উত্তরে আরাবলী পর্ব্বত, দক্ষিণে ধারপ্রমার, পশ্চিমে গুজরাট, এই সীমার মধ্যবর্ত্তী মিবার রাজ্যে গুহলোট (সাধারণতঃ ঘেলোট) বংশীয়গণ আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণে চালুক্যগণ, বঙ্গে পরাক্রান্ত পাল ও সেনবংশীয়গণ, উড়িষ্যায় কেশরীবংশীয়গণ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে যদুবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং যখন গজনির অধিপতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত, এবং গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজগণের আধিপত্য ও প্রবল প্রতাপ ছিল।

জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।—সবক্তগীন লাহোরের অধিপতি জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করাতে জয়পাল দিল্লী আজমীঢ় কান্যকুব্জ ও কালিঞ্জরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই যুদ্ধে সবক্তগীনের জয়লাভ হয়। সবক্তগীন পঞ্জাবে এক জন শাসন-কর্ত্তা রাখিয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করেন।

## সুলতান মাহমূদ।

সবক্তগীনের মৃত্যু ও তদীয় পুত্র মাহমূদের রাজ্যপ্রাপ্তি।—সবক্তগীন বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া লোকান্তরিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ইস্‌মাইল জ্যেষ্ঠের অনুপস্থিতিতে গজনির সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু ইস্-

মাইল দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাহমূদ কাবুলে আসিয়া কনিষ্ঠকে কারাগারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "সুলতান" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন ( ৯৯৯ খ্রীঃ অব্দ )।

**সুলতান মাহমূদের ভারতবর্ষে যাত্রা।**—এই সময়ে সামনী-রাজ্যের জনৈক সেনাপতি ইলিক খাঁ বুখারা অধিকার করিয়াছিলেন। সুলতান মাহমূদ ভারতবর্ষ আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি ইঁহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

**১ম যাত্রা, লাহোর।**—সুলতান মাহমূদ লাহোরের অধিপতি জয়পালকে আক্রমণ করিয়া শতদ্রুর নিকটবর্ত্তী ভাতিণ্ডায় উপনীত হন, এবং শেষে জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালকে রাজা করিয়া বিজয়োল্লাসে গজনিতে প্রস্থান করেন (১০০১)।

**২য় যাত্রা ভাটিয়া।**—অনঙ্গপাল মাহমূদের অনুগত ছিলেন। কিন্তু ইঁহার এক জন সহযোগী ভাটিযার রাজা নিয়মিত কর দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে মাহমূদ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন (১০০৩)।

**৩য় যাত্রা, মুলতান।**—মুলতানের আফ্গান অধিপতি আবুয়ল ফতে লোদী বিদ্রোহী হওয়াতে মাহমূদ ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন (১০০৫)।

**৪র্থ যাত্রা, নগরকোট।**—অনঙ্গপাল উজ্জয়িনী, গোবালিয়র, কালিঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীঢ়ের রাজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মাহমূদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়াতে মাহমূদ চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। এবারে বহু

সন্ধ্য হিন্দু-সৈন্য একত্র হইয়াছিল. হিন্দুমহিলাগণ আপনাদের অলঙ্কারাদি দ্রবীভূত করিয়া যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইয়াছিলেন। মাহমূদ এই সমবেত সৈন্যদলকে অতিবেগে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের সময়ে অনঙ্গপালের হস্তী পলায়ন করাতে হিন্দু-সেনাগণ হতাশ্বাসে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সুতরাং মাহমূদ বিজয়ী হইলেন। অনন্তর তিনি নগরকোট লুণ্ঠন পূর্ব্বক ধনরত্ন লইয়া নিজরাজ্যে গমন করিলেন ( ১০০৮ )।

**৫ম যাত্রা, মুলতান।**—মাহমূদ দ্বিতীয়বার মুলতানে আসিয়া আবুয়ল ফতে লোদীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে গমন করেন ( ১০১০ )।

**৬ষ্ঠ যাত্রা, থানেশ্বর।**—মাহমূদ ষষ্ঠ বার যমুনার তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করেন ( ১০১১ )।

**৭ম ও ৮ম যাত্রা, কাশ্মীর।**—১০১৩ ও ১০১৪ অব্দে সুলতান মাহমূদ কাশ্মীরে আসিয়া সেই দেশ বশীভূত করেন।

**৯ম যাত্রা, মথুরা।**—সুলতান এবার সমৃদ্ধ যুদ্ধসজ্জা করিয়া পেশাবর হইতে কাশ্মীরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কান্যকুব্জে সৈন্য স্থাপন করেন। কান্যকুব্জরাজ বিনাযুদ্ধে সুলতানের শরণাগত হন। ইহাতে সুলতান সেই নগরের কোন অনিষ্ট না করিয়া মথুরার অভিমুখে যাত্রা করেন। মথুরা বিধ্বস্ত হয়। সুলতান বিজয়-গৌরবে স্ফীত হইয়া গজনিতে প্রতিগমন করেন ( ১০১৭ )।

**১০ম ও ১১শ যাত্রা, কান্যকুব্জ ও লাহোর।**—মাহমূদ ইহার পর পাঁচ বৎসর বিশ্রাম করেন। এই সময়ের শেষভাগে কান্যকুব্জরাজ স্বীয় রাজ্য হইতে তাড়িত হওয়াতে

তাঁহার সাহায্যার্থ কান্যকুব্জে উপনীত হন। তিনি কান্যকুব্জ শত্রুপক্ষের হস্তগত দেখিয়া উহা একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার পরে মাহমূদ একাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া লাহোর আপনার অধিকারভুক্ত করেন।

**১২শ যাত্রা, গুজরাট ও সোমনাথ।** ইহার দুই বৎসর পরে সুলতান মাহমূদ অনেক সৈন্য লইয়া গজনি হইতে মুলতানে উপনীত হন, এবং সিন্ধুদেশের মরুভূমি অতিবাহন করিয়া অকস্মাৎ গুজরাটে আগমন করেন। গুজরাটের রাজধানী সহজেই অধিকৃত হয়। ইহার পরে মাহমূদ প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। সমীপবর্ত্তী রাজারা এই মন্দির রক্ষার্থ উপস্থিত হন, কিন্তু সুলতান রাত্রি-শেষে অলক্ষ্যভাবে মন্দিরের নিকটে আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাণ্ডারা বিগ্রহের রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সুলতান তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বিগ্রহের উপর আঘাত করেন। বিগ্রহ দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে অনেক মণি মুক্তা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে মাহমূদ পাণ্ডাদের প্রতিশ্রুত অর্থ অপেক্ষাও অনেক ধন লাভ করেন (১০২৪)। সোমনাথের মন্দিরে চন্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট ছিল। মাহমূদ উহা গজনিতে লইয়া যান। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড এলেনবরার সময়ে উহা আবার ভারতবর্ষে আনীত হয়।

ইহার পর মাহমূদ পারস্য দেশ অধিকার করেন।

**সুলতান মাহমূদের মৃত্যু।** এই বিজয়-গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়ে মাহমূদের মৃত্যু হয়। (১০৩০,২৯এ এপ্রেল)।

মরুভূমি-ভ্রমণ-জনিত রোগই তাঁহার এই অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ।

**মাহমূদের চরিত্র ও রাজ্যশাসন।** কেহ কেহ মাহমূদের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। অপর লেখকেরা তাঁহাকে অতি লোভী ও অন্যায়কারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু সুলতান মাহমূদের চরিত্রে দোষ গুণ, উভয়ই মিশ্রিত ছিল। তাঁহার এমন ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে ধনী দুঃখী, সকলে সুখে বাস করে। অতি দীন হীনেরাও দুঃখ জানাইলে তিনি তাহার প্রতীকার করিতেন। এ বিষয়েব একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; পারস্যদেশে কতকগুলি দস্যু একটি স্ত্রীলোকের সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল; ইহাতে ঐ মহিলা সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ঐ দেশ অনেক দূব, তথাকার উপদ্রব কি প্রকারে শান্ত করা যাইবে? মহিলা বলিল, “যদি প্রজা রক্ষা করিতে না পারেন, তবে দেশ জয় করিয়া কি ফল? রাজা হইয়া প্রজা রক্ষা না করিলে পরমেশ্বরের নিকটে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন?” সুলতান এই কথার যথার্থ ভাব গ্রহণ করিয়া ঐ দূরদেশে দস্যুবৃত্তি নিবারণের উপায় করিলেন। একটি সামান্য স্ত্রীলোক তাঁহাকে এ প্রকার উচ্চ কথা বলিল, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না।

মাহমূদের এই গুণে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। ধনী ও নির্ধন সকলেই নিরুদ্বেগে থাকিত। কিন্তু যে স্থলে মাহমূদ স্বয়ং অর্থগ্রহণের ইচ্ছা করিতেন, সে স্থলে ভাল মন্দ বা ন্যায়ান্যায়ের বিচার করিতেন না। কথিত আছে,

নিসারপুরে এক জন সমৃদ্ধিশালী মুসলমান ছিলেন। মাহমুদ তাঁহার ধনাপহরণ মানসে, অধার্ম্মিক হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া তাঁহার প্রতি অপবাদ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সুলতানকে কহিলেন, "আমার অনেক সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু আমি পৌত্তলিক বা স্বধর্ম্মত্যাগী নহি, যদি আমার ধন লইতে আপনার ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন, অযথা অপবাদ দিয়া আমার যশ হরণ করিবেন না।" এই কথা বলাতেও অর্থলোভী ভূপতি তাঁহার সমুদয় অর্থ হরণ করিলেন। কিন্তু এ দিকে ধার্ম্মিকতার বিষয়ে তাঁহাকে এক সুখ্যাতি-পত্র দিলেন।

মাহমূদ কহিতেন যে, আপনাদের ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্যই তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিলে পুণ্য ও গৌরবলাভ হয়। তিনি এই ধর্ম্মপরায়ণতার নাম করিয়া, অনেক স্থান হইতে অনেক অর্থ অপহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল গর্হিত কার্য্যে তদীয় ধর্ম্মশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি আপনার সমুদয় সম্পত্তি বাহির করাইয়াছিলেন; মৃত্যুকালে ঐ সকল সম্পত্তি দেখিয়া কেবল আপনিই পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল, তথাপি এক কপর্দ্দকও কাহাকে দান করা হইল না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, তিনি কেবল লোভের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেন, ধর্ম্মপরায়ণতা নাম মাত্র।

বিদ্যানুশীলনে মাহমূদের যথোচিত অনুরাগ ছিল। পূর্ব্বে বাগদাদ নগরে যেমন অনেক পণ্ডিত ছিলেন, মাহমূদের সময়ে গজনি নগরেও তেমন অনেক কবি ও বিদ্বান্ লোকের

সমাগম হইয়াছিল। ফেরদওসী নামে যে বিখ্যাত কবি "শাহনামা" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মাহমুদ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। একদা মাহমুদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া ফেরদওসী যত কবিতা রচনা করিবেন, প্রতি কবিতাতে এক এক স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। ফেরদওসী এই আশায় যারপর-নাই পরিশ্রম করিয়া পুস্তক রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে ৬০,০০০ কবিতা ছিল, কিন্তু মাহমুদ তাঁহাকে ৬০,০০০ দ্রম (রৌপ্য মুদ্রা) দিতে চাহিলেন। কবিবর ঐ টাকা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সভা ত্যাগ করেন। মাহমুদ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সভায় আনিতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি না আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া এই ভাবের একটি কবিতা লিখিযা পাঠান, "গজনির রাজসভা রত্নাকর বটে, কিন্তু ঐ রত্নাকর অকূল ও অতলস্পর্শ, আমি রত্নলোভে তাহাতে জাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার লোভই সার হইল, রত্নাদি কিছুই লাভ হইল না।"

উন্সেরী নামে আর এক কবি রাজ-সভাতে ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে চারি শত পণ্ডিতের অধ্যক্ষ করিয়া, আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি কোন পুস্তক প্রস্তুত করিলে উন্সেরী অগ্রে দেখিবেন। পুস্তক তাঁহার মনোনীত হইলে, পরে তাহা সুলতানকে দেখান হইবে। বাগদাদের অধিপতির প্রেরিত আবুরিহান নামক তর্কশাস্ত্র-ব্যবসায়ী আর এক পণ্ডিত রাজ-সভাতে ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

## গজনির পরবর্ত্তী রাজগণ।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে দশ ব্যক্তি খ্রীঃ ১০৩০ হইতে ১১৫২ অব্দ পর্য্যন্ত গজনিতে আধিপত্য করেন। ইহাদের কেহই সুলতানের ন্যায় সাহসী বা বীরত্বশালী ছিলেন না। তৃতীয় ভূপতি সুলতান মহুদের সময়ে লাহোর ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সমুদয় রাজ্যই স্বপ্রধান হইয়া উঠে। শেষ ভূপতির নাম সুলতান বাহরাম। পশ্চিম আফগানিস্তানে হিরাতের ১২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গোর নামে একটি জনপদ আছে। বাহরাম ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিপতিকে বধ করাতে নিহত রাজার ভ্রাতা আলা উদ্দীন ক্রোধান্ধ হইয়া গজনি অধিকার করেন। বাহরম লাহোরে পলায়িত হন। এইরূপে গজনিতে মহামুদবংশীয়ের আধিপত্যের অবসান হয়।

গজনির সুলতানবংশীয়গণ লাহোরে ৩০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। এইরূপে সুলতান মাহমুদের সম্রাট্ উপাধি ধারণের ১৮৩ বৎসর পরে তদীয় বংশের গৌরব ও প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়া যায়।

## গোর-রাজ্য।

**গোর-রাজ্য**—ইহার পরে সবক্তগীনের ভগ্নাবশিষ্ট রাজ্যের উপর গোর-রাজ্য স্থাপিত হয়। গোরীয়েরা আফগান জাতি।

**আলাউদ্দীন, ১১৫২-১১৫৬।**—আলাউদ্দীন গজনি অধিকার করিয়া আপনাকে তথাকার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। আলাউদ্দীনের পরে তদীয় পুত্র সরেফ্ উদ্দীন পিতৃ-

সিংহাসন অধিরোহণ করেন। কিন্তু অন্তর্ব্বিদ্রোহে শীঘ্রই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় ( ১১৫৬ – ১১৫৭ )।

গেয়াস্‌উদ্দীন গোরী, ১১৫৭-১২০২।—আলা-উদ্দীনের দুইটি ভ্রাতৃপুত্র ছিল—গেয়াস্‌উদ্দীন ও শাহাবদ্দিন। তন্মধ্যে গেয়াস্‌উদ্দীন সিংহাসন অধিকার করিয়া ভ্রাতা শাহাবদ্দিনকে সেনাপতি করিলেন। এই দুই ভ্রাতা পরস্পর একমত হইয়া কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন নাই।

শাহাবদ্দিনের ভারতবর্ষ আক্রমণ।—শাহাবদ্দিন সাতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন। তিনি লাহোরে (১১৭৬) আসিয়া সুলতান মাহমূদের শেষ বংশধর দ্বিতীয় খসরুকে পরাজিত করেন। ইহার চারি বৎসর পরে সিন্ধু অধিকৃত হয়। শেষে ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠেন।

পৃথ্বীরাজ।—এই সময়ে চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ-রাজ রাঠোর-বংশীয় জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে বল পূর্ব্বক আনিয়া বিবাহ করেন। চৌহান ও রাঠোর বংশে সম্প্রীতি ছিল না। পৃথ্বীরাজ আজমীঢ়ের রাজা ছিলেন। দিল্লীর পূর্ব্বতন অধিপতি নিঃসন্তান হওয়াতে তিনি আপন দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে পোষ্য পুত্র করেন। ইহাতে দিল্লী ও আজমীঢ় এক হইয়াছিল। এদিকে কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রও দিল্লীশ্বরের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথ্বীরাজকে গ্রহণ করাতে তিনি পৃথ্বীরাজের প্রতি যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে উভয়পক্ষে সর্ব্বদা যুদ্ধাদি হইত।

তিরৌরীর যুদ্ধ।—শাহাবদ্দিন সৈন্য লইয়া ভারত-

বর্ষে উপনীত হইলে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন করিলেন। যদিও কান্যকুব্জ-রাজের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না, তথাপি অনেক রাজপুত রাজা তাঁহার পতাকার অধীনে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। মিবারের অধিপতি সমরসিংহ যোদ্ধ্‌দলের অধিনায়ক হন। উত্তর ভারতের থানেশ্বর ও কর্ণালের মধ্যে তিরৌরী ( রামনারায়ণপুর গ্রাম ) ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শাহাবদ্দিন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন ( ১১৯১ )।

দ্বিতীয় যুদ্ধ।—পরাজিত হওয়ার দুই বৎসর পরে শাহাবদ্দিন অনেক সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। পৃথ্বীরাজ এবারও যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন করেন। তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী ও বহুসংখ্যক পদাতি লইয়া হিন্দুরাজগণ দৃশদ্বতী ( বর্ত্তমান নাম কাগার ) নদীর তীরে ছাউনি করেন। হিন্দুরাজগণ আপনাদের বল-বহুলতা দেখিয়া শাহাবদ্দিনকে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শাহাবদ্দিন কৌশলে উত্তর করিলেন, তিনি ভ্রাতার আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ফিরিতে পারেন না, যে পর্য্যন্ত এই অনুমতি না আইসে, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইহাতে হিন্দুরাজগণ আমোদে মত্ত হইলেন। শাহাবদ্দিন সময় বুঝিয়া রাত্রিকালে নদী পার হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হঠাৎ আক্রমণে হিন্দু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ অসীমসাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন। শাহাবদ্দিনের বিজয়-পতাকা ভারতবর্ষে উড্ডীন হইল ( ১১৯৩ )।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সংবাদে তদীয় পত্নী সংযুক্তা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। প্রসিদ্ধ কবি চাঁদবর্দ্দে পৃথ্বীরাজের চরিত্র মধুর গীতি-কবিতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য স্থান অধিকার।—শাহাবদ্দিন ইহার পরে কান্যকুব্জ, বারাণসী ও গোবালিয়র অধিকার করেন। অপর দিকে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি কোতোবদ্দিন, গুজরাট, অযোধ্যা ও বিহার জয়ে নিযুক্ত হন।

শাহাবদ্দিন মহম্মদ গোরী, ১২০২-১২০৬।—গেয়াসদ্দিনের মৃত্যুর পর শাহাবদ্দিন "মহম্মদ গোরী" নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। মহম্মদ বিদ্রোহী গোরক্ষ জাতিকে পরাজিত করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে, পথে একদা রাত্রিকালে আপন পটবাসে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে কতিপয় গোরক্ষ নদী পার হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করে।

গোর-রাজ্য বিভাগ।—মহম্মদ গোরীর মৃত্যুর পর গোর-রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। কোতোবদ্দিন ইবক্‌দিল্লী অধিকার করেন। ইলদাজ নামে আর এক জন ক্রীতদাস গজনির অধিপতি হন, কিন্তু তিনি শেষে খারিজম-রাজ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লন। নসীরউদ্দীন মুলতান ও সিন্ধু অধিকার করেন।

# পাঠান-বংশ।

## দাসরাজ-শ্রেণী।

দিল্লীতে পাঠানদিগের আধিপত্য কোতোবদ্দিন ইবক্ হইতে আরম্ভ হয়। কোতোবদ্দিন মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। সুতরাং ইহার বংশধরগণ দাসরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কোতোবদ্দিনের পূর্ব্বতন অবস্থা।—কোতোবদ্দিন তুর্কিস্তানের এক সামান্য লোকের পুত্র। বাল্যকালে তাঁহাকে কোন মহাজন ক্রয় করিয়া নিসারপুরে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বিক্রয় করে। এই ব্যক্তি কোতোবদ্দিনকে বিদ্যাশিক্ষা করান। পরে মহম্মদ গোরী কোতবোদ্দিনকে ক্রয় করেন। মহম্মদ কোতোবের গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহাকে অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ করিয়া দেন।

কোতোবদ্দিন চারি বৎসর কাল দিল্লীতে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইহার পরে তদীয় পুত্র আরাম (১২১০) পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষে তাঁহার ভগিনীপতি সমসউদ্দীন আলতমস্ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধিপতি হন।

সমসউদ্দীন আলতমস, ১২১১-১২৩৬।—আলতমস যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন গেয়াসউদ্দীন বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাবগণ নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। আলতমস্ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আগমন করিলে, বৃদ্ধ গেয়াস আপনাকে দিল্লীর অধীন বলিয়া

স্বীকার করেন। গেয়াসের উত্তরাধিকারী মালিক খিল্‌জী এই অধীনতা অস্বীকার করিলে আর একবার আল্‌তমসকে তথায় যাইয়া বাঙ্গালা জয় করিয়া লইতে হয়। মুলতান, কচ্ছ ও সিন্ধু প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। অল্পকাল মধ্যে আলতমস্ কান্যকুব্জ, বিহার, মালব ও গোবালিয়র অধিকার করেন। আলতমসের রাজত্ব-কালে মোগল ভূপতি প্রসিদ্ধ চঙ্গেজ্ খাঁর অধীনে বহুসংখ্য সৈন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য জয় করিতে উদ্যত হয়। খারিজমের রাজা জেলালউদ্দীন চঙ্গেজ্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আশ্রয় পাইবার মানসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু আল্‌তমস তাহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন (১২১৮)। এই যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যে আল্‌তমস চঙ্গেজেব ভীষণ আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করেন। ১২৩৬ অব্দে আল্‌তমসের মৃত্যু হয়।

রোকোনদ্দিন ফিরোজ, ১২৩৬-১২৩৯।—আল্‌তমসের মৃত্যুর পর রোকোনদ্দিন ফিরোজ বাদশাহ্ হন। কিন্তু তিনি সাতিশয় ইন্দ্রিয়পর ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তাঁহার মাতা রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। ইনি আবার অতিশয় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। এ জন্য প্রজারা রোকোনদ্দিনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাঁহার সহোদরা সুল্‌তানা রেজিয়াকে সিংহাসনে আরোহিত করে।

সুলতানা রেজিয়া, ১২৩৬-১২৩৯।—রেজিয়া সমস্ত রাজগুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাদৃশ বিদ্যাবতী ছিলেন না বটে, কিন্তু কোরাণখানি সুন্দররূপে পাঠ করিতে পারিতেন। রাজকার্য্যে রেজিয়া এমন বিচক্ষণ ছিলেন যে,

আলতমস স্থানান্তরে যাইবার সময়ে পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাইতেন।

রেজিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়া দরবারে বসিতেন, রাজদূত আসিলে স্বয়ং তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন এবং স্বয়ং প্রধান প্রধান বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব্বের রাজনীতি সংশোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু রেজিয়া অবলা-সুলভ কোমলতা ও স্নেহাতিশয্যবশতঃ এক জন আবিসীনিয়াবাসী ক্রীতদাসকে সাতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই ক্রীতদাস "আমিরল ওমরা" নামক সম্মানসূচক উপাধির অধিকারী হইল। এজন্য রাজ্যের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি রেজিয়ার বিপক্ষ হইলেন। রেজিয়া এই বিদ্রোহের নিবারণ জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। রেজিয়া তিন বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মাজাদ্দিন বাহরাম, ১২৩৯-১২৪১।—রেজিয়ার ভ্রাতা মাজাদ্দিন বাহরাম রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু সাতিশয় স্বেচ্ছাচারী হওয়াতে শীঘ্রই নিহত হন।

আলাউদ্দীন মসউদ, ১২৪১-১২৪৬।—রোকানদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দীন মস্উদ বাহরামের স্থলে রাজ্যাধিকারী হন। তিনিও বাহরামের ন্যায় সাতিশয় দুরাচার, ইন্দ্রিয়পর ও মূর্খ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেও বাহরামের অদৃষ্টভাগী হইতে হয়।

নাসের উদ্দীন মহম্মদ, ১২৪৬-১২৬৬।—ইহার পর মাজাদ্দিন বাহরামের পুত্র নাসের উদ্দীন মহম্মদ

দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি দয়ালু, ধার্ম্মিক ও মিতাচারী ছিলেন। গেয়াসদ্দিন বোলবন নামক এক জন সুবিবেচক ও সুদক্ষ ক্রীতদাস তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। গেয়াস কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য অধিকার করেন। নাসের উদ্দীন মন্ত্রীর এইরূপ পরাক্রমদর্শনে ভীত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু শেষে ভয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হন। ইহাতে বোলবন নাসেরের প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হন নাই। কর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্তির পরে তিনি নাসেরের পক্ষ হইয়া মোগলদিগকে পঞ্জাব হইতে দূরীভূত করেন। নাসের উদ্দীনের মৃত্যু হইলে বোলবন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

নাসের উদ্দীন রাজ্যাধিপতি হইয়াও সামান্য ভাবে থাকিতেন। তিনি স্বহস্তে সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মহিষী স্বহস্তে তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন। তাঁহার এমন শীলতা ছিল যে, শুনিলে বিস্ময় জন্মে। একদা তিনি স্বহস্তে একখানি পুস্তক লিখিয়া কোন আত্মীয়কে দেখাইলে, আত্মীয় পুস্তকের একটি বাক্য অশুদ্ধ বলিয়া তাহা সংশোধন করিতে নাসেরকে অনুরোধ করিলেন। নাসের তাঁহার অনুরোধে সেই কথাটি কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট বাক্য লিখিয়া রাখিলেন; ইহার পরে সেই ব্যক্তি চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার সেই কথা কাটিয়া আপনার কথাটি বসাইলেন। সমীপবর্ত্তী কোন ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নাসের উত্তর করিলেন, "ঐ বাক্যটি শুদ্ধ লিখিত ছিল, কিন্তু না কাটিলে পাছে আত্মীয় ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ণ হন, এই জন্য কাটিয়াছিলাম, পরে অশুদ্ধ বাক্য

পুস্তকে রাখা উচিত নহে বোধ করিয়া, আবার সংশোধন করিয়া রাখিলাম।”

**গেয়াসদ্দিন বোলবন্, ১২৬৬-১২৮৬।**—নাসের অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগত হওয়াতে গেয়াসদ্দিন বোলবন্ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। দস্যুদমন, বিদ্রোহ নিবারণ, জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ, কর্ম্মক্ষম সৈন্য প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার রাজত্বের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয়। মোগলেরা পুনর্ব্বার বিতস্তা পার হইলে বোলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদিগকে অপর পারে তাড়াইয়া দেন।

মোগলদিগের আক্রমণের সুযোগে বাঙ্গালার নবাব তোগরল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন; অধিকন্তু নিজের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। বোলবন্ ক্রমান্বয়ে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু দুই দলই তোগরল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অবশেষে বোলবন্ বাঙ্গালায় যাত্রা করিলে তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য তোগরলকে নিহত করে। বাঙ্গালা পুনর্ব্বার দিল্লীর অধীন হয়। বোলবন্ মধ্যম পুত্র বখর খাঁকে বাঙ্গালায় রাখিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক মাস পরে আর এক বার মোগলেরা পঞ্জাবে উপস্থিত হয়। তাহাদের সহিত যুদ্ধে বোলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হন। এই দুঃসহ দুঃখে অশীতিবর্ষ বয়সে বোলবনের মৃত্যু হয়।

**কায়কোবাদ, ১২৮৬-১২৮৮।**—মন্ত্রীদের পরামর্শে বখর খাঁর পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনি অতুল সম্পত্তি পাইয়া শীঘ্রই বিলাসী হইয়া উঠিলেন। দিন রাত্রি কেবল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত

হইতে লাগিল; রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। বখর খাঁ পত্র লিখিয়া পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন; শেষে দিল্লীতে আসিলে অযোধ্যা প্রদেশে সরযূর তটে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। সেখানে নানাবিধ অপমান সহ্য করিয়াও বখর খাঁ পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে নবাব বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে কায়কোবাদ আবার বিলাসী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় খিল্‌জীবংশীয় জালালউদ্দীন তাঁহার প্রাণ বধ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

## খিল্‌জী বংশ, ১২৮৮-১৩২১।

জালালউদ্দীন খিল্‌জী, ১২৮৮-১২৯৫।—জালাল-উদ্দীন ৭০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। তিনি নিতান্ত দয়ালু ছিলেন। দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকটে নিষ্কৃতি পাইত। তাঁহার রাজত্বকালে মালব ও উজ্জয়িনী অধিকৃত হয়। ১২৯২ অব্দে মোগলেরা একবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। জালালউদ্দীন আপনার ভ্রাতৃপুত্র আলা-উদ্দীনকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আলাউদ্দীনের বাসনা ছিল, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এজন্য যুদ্ধের ব্যয় সংগ্রহার্থ তিনি সহসা দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া দেবগিরিতে উপস্থিত হন। দেবগিরি-রাজ রামদেব শত্রুদর্শনে ভীত হইয়া বিপুল অর্থ দিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এদিকে জালালউদ্দীন বিজয়ী ভ্রাতৃপুত্রকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদে উপস্থিত হইলে আলাউদ্দীনের

অবশেষক্রমে তাঁহার সহচরেরা জালালের প্রাণ বধ করে। আলা উদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীর সম্রাট্ হন।

আলাউদ্দীন খিল্‌জী, ১২৯৫-১৩১৭। আলা দিল্লীর বাদশাহ হইয়া গুজরাট অধিকার করেন *। কিছু দিন পরে উজ্জয়িনী ও রিস্তাম্বর অধিকৃত হয়।

মোগলদিগের অবিশ্রান্ত আক্রমণে এবং আলা উদ্দীনের দক্ষিণাপথে গমনে আর্য্যাবর্ত্তের চারি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাতে আলা উদ্দীনের হৃদয় বিকৃত হইয়া উঠে। তাঁহার দৌরাত্ম্যে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারিত না, গোপনে পরামর্শ করিতে পারিত না, এবং কেহ কাহারও সহিত আত্মীয়তা করিতে সাহসী হইত না। রাত্রিদিন গুপ্তচরগণ সকল গৃহের সংবাদ আনিয়া বাদশাহের কর্ণগোচর করিত। হিন্দুদিগের জন্য কঠোর আইন প্রচারিত, এবং কৃষকদিগের লাঙ্গল ও বলদের উপর কর নির্দ্ধারিত হয়। কৃষকদিগকে উপস্বত্বের অর্দ্ধেক রাজভাণ্ডারে দিতে হইত। এই সমুদয় ধনে অসংখ্য

* এই ঘটনার সহিত কমলা দেবী ও দেবল দেবীর বিবরণের সম্বন্ধ আছে। গুজরাটের রাজমহিষীর নাম কমলা দেবী, তিনি পরমরূপবতী ছিলেন। আলাউদ্দীন গুজরাট অধিকার করিয়া তাঁহাকে প্রধান মহিষী করেন। এদিকে গুজরাটের অধিপতি স্বীয় কন্যা দেবল দেবীকে লইয়া মহারাষ্ট্রে পলায়ন করেন। পরিশেষে কমলা দেবীর অনুরোধে দেবল দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। আলার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইহার পরে দেবল দেবী মোবারকের ক্রীতদাস খসরুর অন্তঃপুরে আনীত হন। গেয়াস উদ্দীন তগলক দিল্লীর অধিপতি হইলে, দেবল দেবী তাঁহার রক্ষাধীনে অবস্থিতি করেন। গেয়াস ইঁহার প্রতি কখনও অসৌজন্য বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

সৈন্য পোষিত ও চারি দিকে দুর্গসকল নির্ম্মিত হইত। আলা এই সৈন্য লইয়া (১৩০৩) চিতোর অধিকার করেন, এবং মোগলদিগকে তাড়াইয়া দেন।

গুজরাট অধিকারকালে কাফুর নামক এক জন দাস দিল্লীতে আনীত হয়। এ ব্যক্তি সুশ্রী ও সাহসী ছিল। ক্রমে এই দাস প্রভুর অনুরাগ-ভাজন হইয়া উঠে। কাফুর প্রথমে দেবগিরির রাজা রামদেবকে দমন করিতে প্রেরিত হয়। যুদ্ধে রামদেব পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন। তৎপরে কাফুর তৈলঙ্গের রাজা লক্ষধর দেব এবং দ্বারসমুদ্রের অধিপতি বল্লাল দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লক্ষধর সন্ধি করেন। বল্লাল হত হওয়াতে দ্বারসমুদ্র অধিকৃত হয়।

এ দিকে কাফুরের পরামর্শে সম্রাটের পুরাতন ভৃত্য সকল অপদস্থ বা হত হইল। আইন সকল অসহ্য হওয়াতে পুনর্ব্বার চারি দিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। আলা এরূপ নির্দ্দয় ছিলেন যে, কয়েক জন মোগল বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে, তিনি এক দিন ১৫ হাজার মোগলের প্রাণবধ করেন। এইরূপে রাজার অত্যাচারে চারি দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সকল আরম্ভ হইল। এমন সময়ে সহসা আলার মৃত্যু হয়।

দিল্লীর বাদশাহ হইতে কাফুরের একান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। আলার তৃতীয় পুত্র মোবারক খিল্‌জী তাঁহাকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

**কোতোবদ্দিন মোবারক খিল্‌জী, ১৩১৭-১৩২০।**—মোবারক খিল্‌জী তাঁহার বহুগুণান্বিত পিতার

বহু-গুণ-পূর্ণ নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনার তিন ভ্রাতাকে অন্ধ করিলেন, দুই জন ক্ষমতা-পন্ন সর্দ্দারকে নিহত করিলেন, এবং সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া তুলিলেন। এই কার্য্যসম্পাদনের পর মোবারক খসরু নামক তাঁহার এক জন ক্রীতদাসকে প্রধান মন্ত্রী করেন। খসরু মলবার জয় করে ( ১৩১৯ ), এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর দিল্লীতে আসিয়া মোবারককে সবংশে নিহত করিয়া, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়।

কিন্তু ইহাতে খসরুর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। গেয়াস-উদ্দীন তগলক বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপ-স্থিত হইলেন। দিল্লী অধিকৃত ও খসরু নিহত হইল। গেয়াস দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এই তগলক বংশীয়গণ দিল্লীতে প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

## তগলক-বংশ, ১৩২১-১৪১৪।

গেয়াসউদ্দীন তগলক, ১৩২১-১৩২৫।— ইহার প্রকৃত নাম গেয়াস উদ্দীন গাজিউল্‌মোলক। গেয়াস উদ্দীন বোল্‌বনের এক জন ক্রীত দাস। তিনি প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। প্রজাগণ একবারে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে, পতিত ভূমি সকল কর্ষিত হয়, কর সকল বিরক্তিকর না হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। গেয়াস স্বীয় পুত্র জুনা খাঁকে রাজধানীতে রাখিয়া বাঙ্গালায় যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিলে, জুনা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি কাষ্ঠময় মঞ্চ নির্ম্মাণ করান। এই মঞ্চ হইতে পতিত হওয়াতে গেয়াসের মৃত্যু হয়।

**মহম্মদ তগলক, ১৩২৫-১৩৫১।**—জুনা খাঁ মহম্মদ তগলক নাম ধারণ করিয়া সম্রাট হন। ইহার প্রকৃত নাম ফখরুদ্দিন মহম্মদ আলগ্‌খাঁ। মহম্মদ সুশিক্ষিত, সাহসী কিন্তু নৃশংস, নীতিজ্ঞানশূন্য ও কল্পনাযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে মোগলদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। ইহার পর দক্ষিণাপথে তাঁহার অধিকার প্রসারিত হয়। কিন্তু শেষে তাঁহার অত্যাচার বাড়িয়া উঠে। প্রজাগণকে শোষণ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবেন, রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগিরিতে উঠাইয়া লইবেন, অসংখ্য সৈন্য পোষণ করিয়া খোরাসান ও পারশ্য অধিকার করিবেন, এই সকল কল্পনায় তাঁহার দিনরাত্রি অতিবাহিত হইত। প্রথমে পারশ্য-জয়ের জন্য, ৩, ৭০, ০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। অবশেষে মহম্মদ চীন জয় করিতে এক লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন; ইহারা হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে সমূলে বিনষ্ট হইল। মহম্মদ এই সকল সৈন্যের জন্য অর্থসংগ্রহে অসমর্থ হওয়াতে কৃষকদিগের কর বৃদ্ধি করিলেন। কৃষকেরা লাঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। সম্রাট জঙ্গল আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিলেন। রাজধানী স্থাপন করিবার মানসে দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতাকে দেবগিরিতে আনয়ন করা হইল। দিল্লী শ্মশান হইয়া পড়িল। অবশেষে সম্রাট এ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পরে তিনি কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহাজনেরা উহা গ্রহণ করিল না। এজন্য রাজস্বের ব্যাঘাত হইল। দেশ বৃষ্টি-শূন্য, ক্ষেত্র কৃষক-শূন্য হইয়া পড়িল। চারি দিকে

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিল, শত শত লোক প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। ইহার উপর চারি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গ স্বাধীন হইল, মালব, পঞ্জাব ও গুজরাট বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল, কর্ণাটের রাজগণ বিজয়নগরে নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন, হোসেন বাহমনী নামক এক জন মুসলমান মধ্যদেশে আর এক নূতন রাজ্যের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

হোসেনের বাল্যাবস্থায় গঙ্গ নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিশেষ উপকার করে, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ হোসেন আপনাকে ব্রাহ্মণানুগৃহীত বা বাহমনী বলিত।

যাহা হউক, মহম্মদ স্বয়ং এই সকল বিদ্রোহ নিবারণ করিতে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মালব ও পঞ্জাবের বিদ্রোহ সহজেই নিবারিত হইল, কিন্তু অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ নিবারণ করা সহজ হইল না। মহম্মদ অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে সিন্ধুর অন্তঃপাতী তাত্তায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে, যে সকল সম্রাট খলিফাগণের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা বাদশাহ নামের যোগ্য নহেন। এজন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মিসরের খলিফাগণের নিকট হইতে বাদশাহ হওয়ার সনন্দ আনয়ন করেন।

**ফিরোজ শাহ, ১৩৫১-১৩৮৮।**—মহম্মদের মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। ইহার রাজত্বকালে যুদ্ধ বিদ্রোহ তাদৃশ ছিল না, সুতরাং ইনি প্রজাবর্গের হিতসাধনার্থ অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ফিরোজ রাজ্যের স্থানে স্থানে স্নানাগার, চিকিৎসালয়, পান্থশালা, সেতু, জলাশয়, চতুষ্পাঠী ও সুরম্য হর্ম্ম্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ফিরোজ কর্ণাল হইতে হাঁসিহিসা পর্য্যন্ত যে খাল খনন করেন, তাহাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার এক শাখা কাগার ও অপর শাখা শতদ্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এই খালদ্বারা কৃষিকার্য্যের উপকার হইত। ফিরোজের মৃত্যুর পরে ঐ খাল ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা উহার এক অংশ কাটাইয়া দিয়াছেন। ঐ অংশ অন্যূন এক শত ক্রোশ পরিমিত হইবে।

ফিরোজ শাহ বাঙ্গালা ও দক্ষিণাপথ জয় করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি ঐ দুই স্থান স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন।

ফিরোজ শান্তিপ্রিয় ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি সদ্ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন, এবং সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড ও দৈহিক অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা একবারে উঠাইয়া দেন।

ফিরোজ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজ্য শাসন করিতে অসমর্থ হওয়াতে মন্ত্রীর হস্তে শাসন-ভার দেন, এবং আপন তনয় নাশের উদ্দীনকে রাজা করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। নাশের উদ্দীন রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুই জন পিতৃব্যপুত্র বৃদ্ধ রাজাকে হস্তগত করিয়া নাসেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করেন। যুদ্ধে নাসেরের পরাজয় হয় ইহার পরে তাঁহারা প্রকাশ করিলেন, ফিরোজ শাহ তাঁহার পৌত্র গেয়াস উদ্দীনকে

রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ৯০ বৎসর বয়সে ফিরোজের মৃত্যু হয়।

**দ্বিতীয় গেয়াস উদ্দীন তগলক, ১৩৮৮-১৩৮৯।**—যে দুই জন আত্মীয়ের যত্নে ও উদ্‌যোগে গেয়াসউদ্দীন সিংহাসন পাইয়াছিলেন, রাজা হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে অবিলম্বেই তাঁহারা গেয়াসকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিলেন।

**আবুবকর তগলক, ১৩৮৯-১৩৯০।**—গেয়াসের ভ্রাতা আবুবকর বাদশাহ হন। কিন্তু নাসের উদ্দীন সত্বরতার সহিত বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আসিয়া, তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

**নাসের উদ্দীন তগলক, ১৩৯০-১৩৯৪।**—নাসের অবশেষে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি চারি বৎসর নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন পিতার সিংহাসনের অধিকারী হন। কিন্তু ৪৫ দিবস রাজ্যসুখ ভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ তগলক রাজ-দণ্ড গ্রহণ করেন।

**মহম্মদ তগলক, ১৩৯৪-১৪১৪।**—ইহার রাজত্ব কালে শান্তিসুখ একবারে অন্তর্হিত হয়। চারি দিকেই আত্মকলহ, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। মালব, গুজরাট ও খান্দেশ দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। দিল্লী নগরেও পরস্পর-বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে আর এক ভয়ানক উপদ্রব ঘটে।

বহুসংখ্য মোগল তিমুরলঙ্গের অধীনে সজ্জিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় দিল্লীতে উপনীত হয়।

**তিমুরলঙ্গের ভারতবর্ষ আক্রমণ, ১৩৯৮।—** মোগলদিগের এই অধিনায়কের আদিম নাম আমীর তিমুর। খঞ্জ ছিলেন বলিয়া, তিনি তিমুরলঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। লঙ্গ শব্দের অর্থ খঞ্জ। যাহা হউক, তিমুর পারশ্য, তাতার, সাই-বিরিয়া লুণ্ঠন পূর্ব্বক কাবুল দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করেন। শতদ্রুর তটে এই দুই দল সৈন্য একত্র হইয়া পথবর্ত্তী দেশ সমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হয়।

মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করিলেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলু-ণ্ঠিত ও দগ্ধ হইল। অধিবাসিগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে লাগিল। ইহার পরে (১৩৯৯) মোগলেরা মিরাট অধিকার করে, এবং পুনর্ব্বার কাবুল দিয়া আপনাদের দেশে ফিরিয়া যায়।

মহম্মদ ভগ্নহৃদয়ে গুজরাট হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। ছয় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে দৌলত খাঁ লোদী বাদশাহ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৫ মাস অতীত না হইতে হইতেই তৈমুরের প্রতিনিধি খেজের খাঁ ৬০০০ সৈন্যের সহিত দিল্লীতে আসিয়া দৌলত খাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন।

খেজের খাঁ সৈয়দ-বংশীয় ছিলেন। ইহারা ৩৬ বৎসর দিল্লীতে আধিপত্য করেন।

## সৈয়দ-বংশ, ১৪১৪-১৪৫০।

**সৈয়দ খেজের খাঁ, ১৪১৪-১৪২১।—**ইহার প্রকৃত

নাম রায়াত আলী খেজের খাঁ। খেজের খাঁ, তিমুরের প্রতিনিধি হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি স্বাধীন ছিলেন। এই সময়ে দিল্লী ভগ্নদশাপন্ন হইয়াছিল, আবাস-গৃহ শূন্য, ও চারি দিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যে সমস্ত রাজা ও সুবাদার দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, খেজের খাঁ বাদশাহ হইয়া তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সৈয়দ মোবারক, ১৪২১-১৪৩৬।—খেজেরের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র মোবারক বাদশাহ হন। এই সময়ে পঞ্জাবে সাতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মোবারক শিষ্ট ও শান্ত ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ শৌর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন না, এজন্য রাজ্য বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার মন্ত্রী-কর্ত্তৃক নিহত হন।

সৈয়দ মহম্মদ, ১৪৩৬-১৪৪৪।—মোবারকের পুত্র সৈয়দ মহম্মদ শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে মালবের অধিপতি দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বহ্‌লুল লোদীর সাহায্যে তাঁহাকে দূরীভূত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আলা উদ্দীন সিংহাসনে আরোহিত হন।

সৈয়দ আলা উদ্দীন, ১৪৪৪-১৪৫০।—আলা উদ্দীন তাঁহার রাজপাট দিল্লী হইতে বদায়ুনে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু ইহাতে সুফল হয় নাই। এই অবসরে পরাক্রান্ত বহ্‌লুল আফগান লোদী দিল্লী আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই লোদী বংশীয়গণ দিল্লীতে ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

## লোদী-বংশ, ১৪৫০-১৫২৬।

**বহ্লুল লোদী, ১৪৫০-১৪৮৮।**—বহ্লুল দিল্লী অধিকার করাতে পঞ্জাব দিল্লী রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হয়। ১৪৫২ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুরের রাজা দিল্লী আক্রমণ করেন। ইহাতে ২৬ বৎসর কাল বহ্লুলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অবশেষে জৌনপুর-রাজ পরাজিত হন, তাঁহার রাজ্য দিল্লীর অধীন হয়। বহ্লুল অন্যান্য স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে দিল্লীরাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বারাণসী ও পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

**সেকেন্দর লোদী, ১৪৮৮-১৫০৬।**—বহ্লুলের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র সেকেন্দর লোদী বাদশাহ হইয়া বিহার অধিকার করেন। তিনি ক্ষমতাপন্ন ও শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় বংশধরগণের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হওয়ার সূত্রপাত হয়।

**এব্রাহিম লোদী, ১৫০৬-১৫২৬।**—সেকেন্দরের পুত্র এব্রাহিম লোদী, দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি সাতিশয় গর্ব্বিত ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন, রাজ্যমধ্যে কঠোর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। এজন্য অনেক সর্দ্দার ও সুবাদার বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নানা স্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ এব্রাহিমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উপায়ও অদূরবর্ত্তী ছিল না। যে জাতি বহু বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, যাহাদের বিজয়িনী শক্তি কাবুল হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল, দৌলত খাঁ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা

করিলেন। এই পরাক্রান্ত জাতির নাম মোগল। ইহারা তিমুর-লঙ্গের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বাবরের অধীনে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল।

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণ, ১৫২৪।—দৌলত খাঁ বাবরকে আহ্বান করিলে তিনি আহ্লাদসহকারে সৈন্যগণের সহিত পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়াই তিনি আহ্বানকারী শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ ও কারাগারে অবরোধ করিলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬।—বাবর অবশেষে এব্রাহিমের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পানিপথে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন; বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মোগল-রাজত্বের অভ্যুদয় হয়।

পাঠান রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।—এব্রাহিম লোদীর সহিত পাঠান-রাজত্বের অবসান হয়। সুলতান মাহমূদ ও মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও তাঁহারা এখানে রাজত্ব করেন নাই। তাঁহারা বিজয়োন্মত্ত ও অর্থলোভী হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন, এবং শেষে বিজয় ও অর্থ লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কোতোবদ্দিন হইতেই দিল্লীতে হিন্দু-রাজত্বের শেষ হয়। পাঠানেরা তিন শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের কোন গোষ্ঠী তিন চারি পুরুষের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ইঁহারা অনেকেই রাজানুগ্রহে বা বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা সাতিশয় যথেচ্ছাচারী ছিলেন।

প্রজাদের ধন, প্রাণ, সমস্তই, ইহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। ইহারা দুর্ব্বৃত্ত হইলে প্রজাদের কষ্টের একশেষ হইত, সাধু ও সচ্চরিত্র হইলে প্রজারা স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইত। সুতরাং বিভিন্ন অধিপতির শাসনে রাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা ছিল। পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন পাঠান রাজগণের রাজত্বের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এই রাজত্বে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিশদরূপে দেখাইবার জন্য, এই স্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের সার সঙ্কলিত হইতেছে। ইহাতে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন পাঠান রাজগণের দোষ ও গুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

হিন্দু রাজগণের আধিপত্যেব সময়ে কোতোবদ্দিন ইবক্ দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি সাহসী, কার্য্যক্ষম এবং উদার প্রকৃতি ছিলেন, কিন্তু রাজ্য-প্রাপ্তির পর অলস ও অমিতা-চারী হইয়া উঠেন। তাঁহার পুত্র আরামের রাজ্যশাসনোচিত কোনও গুণ ছিল না। আলতমস্ পরিশ্রমী ও কার্য্য-কুশল ছিলেন বটে, কিন্তু আপনার শাসন-সময়ে ঐ কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিবাব অবসর পান নাই। রোকোনদ্দিন্ ফিরোজ হীনবল ও রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতার নিষ্ঠুরতায় ও অবিবেচনায় তদীয় অধোগতির সূত্রপাত হয়। সুলতানা রেজিয়ার ক্ষমতা ও গুণ, উভয়ই দিল্লীর সিংহাসন গৌরবান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নারী-জন-সুলভ কোমল-তায় উন্নতাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির দুরাশার সঞ্চার হয়। এজন্য রাজ্য-মধ্যে গোলযোগ ঘটে। রেজিয়া পরাজিত ও শেষে মৃত্যু-মুখে পাতিত হন। এইরূপে এই গুণবতী মহিলা অবলা-হৃদয়ের

পরিচয় দিয়া ঘাতকের কঠোর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রেজিয়ার উত্তরাধিকারী মাজাদ্দিন বাহ্রাম কোনও গুণের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি সৌখীন ও হীনবল ছিলেন। তদীয় উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মস্উদও দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দেন। এই অকর্ম্মণ্যতাপ্রযুক্ত ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। মস্উদ কারারুদ্ধ হন, তাঁহার খুল্লতাত নাসেরউদ্দীন মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিনব অধিপতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত থাকাতে রাজ্যের উন্নতি-সাধক কোন কার্য্যে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। গেয়াস্উদ্দীন বোল্বনের রাজত্বে অনেকাংশে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী কায়কোবাদ দুশ্চরিত্র ও দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না। প্রত্যেক সাহসী বা ক্ষমতাশালী লোকই সিংহাসন লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই অরাজক সময়ে খিল্জী বংশীয় লোকের অদৃষ্ট অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হয়। জালাল্উদ্দীন খিল্জী দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। ইনি সাধু-প্রকৃতি ও সদাশয় ছিলেন। দয়া, ধর্ম্ম ও কোমলতায় ইঁহার হৃদয় প্রশস্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য-শাসনে ইনি তাদৃশ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। জালাল্উদ্দীন সকল বিষয়েই আপনার হৃদয়ের কোমলতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হন। এজন্য রাজ্যের দুষ্টপ্রকৃতি লোক ক্রমে অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। জালাল্উদ্দীন আপনার এই অনুচিত কোমলতাদোষেই স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রের চক্রান্তে নিহত হন। আলাউদ্দীন খিল্জী নিষ্ঠুর-প্রকৃতি, অত্যাচারী ও দুরাশয় ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি এই বীরত্ব-বলে দক্ষিণাপথের অনেক স্থান দিল্লীর অধীন করেন।

আলাউদ্দীন খিল্‌জীর সময় হইতে তিমুরলঙ্গের আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাস বড় অত্যাচার ও অবিচারের ঘটনায় পূর্ণ। এই সময়ে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। সিংহাসন লইবার জন্য সকলেই সকলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। রাজ্য মধ্যে নরহত্যা, নরচক্ষুরুৎপাটন প্রভৃতি অবিচ্ছেদ চলিতেছিল। এক রাত্রিতেই মোবারক খিল্‌জী আপনার তনয়গণের সহিত নিহত হন। অবশেষে তগলক বংশের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। গেয়াস্‌উদ্দীন গাজিউল্‌-মোলক্ রাজকীয় পদ অধিকার করিলে এই শোচনীয় কাণ্ড কিছুকাল বন্ধ থাকে। গেয়াস্‌উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন। ইনি বিদ্যার সমাদর করিতেন। রাজ্যের নিরক্ষর গরিব দুঃখীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে ইহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। গেয়াস্‌উদ্দীনের পুত্র ফখরুদ্দিন মহম্মদ আলগ্ খাঁ (জুনা খাঁ) একুশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে রাজ্যে বড় অত্যাচার ও গোলযোগ ছিল। ফিরোজ শাহ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন, মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়া, সাধারণের উপকার করেন বটে, কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে তাদৃশ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পরে দ্বিতীয় গেয়াস্‌উদ্দীন তগলক, আবুবকর ও নাসেরউদ্দীন তগলকের সময়েও রাজ্যের কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। মহম্মদ তগলক আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নসরেৎ শাহের সহিত তিন বৎসর কাল বিবাদ করিয়া রাজ্যের সকল বিষয় গোলযোগ-পূর্ণ করিয়া তুলেন। এই সময়ে

তিমুরলঙ্গ, সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেন।

সৈয়দবংশীয় রায়াত আলী খেজের খাঁর অধিকার হইতে প্রথম মোগল সম্রাট্ জহির উদ্দীন মহম্মদ বাবর শাহের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আবার পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। খেজের খাঁর উত্তরাধিকারী সৈয়দ মোবারক গুণবান্ ছিলেন। কিন্তু তিনি গুণের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অল্পকালের মধ্যেই দুরাচার মন্ত্রী মোবারক্‌কে বধ করে। সৈয়দ মহম্মদ ও সৈয়দ আলাউদ্দীন উভয়েই অকর্ম্মণ্য ছিলেন। শেষোক্ত রাজা আপনার রাজধানী দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করেন। এই অবসরে লোদীবংশের অভ্যুদয় হয়। বহ্‌লুল আফগান লোদী সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক আপনার আধিপত্য স্থাপনের জন্য অনেকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কেবল এক দিল্লী ব্যতীত আর সমস্ত জনপদই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। এজন্য বহ্‌লুলকে বড় বিব্রত হইতে হয়। সেকন্দর লোদী বহ্‌লুলের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না, সুতরাং তিনি চারি দিকের বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী এব্রাহিম লোদী অত্যাচারী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন। ইঁহারই অত্যাচারে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। এই সময়ে দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, বিদেশী তাতার ভূপতিও মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। পানিপথে এব্রাহিমের সহিত, বাবরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এব্রাহিম নিহত হন। দিল্লীর সিংহাসন তিমুর-বংশধরের হস্তগত হয়।

পাঠান-রাজগণের এই পরিচয়ে বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের সকলের রাজত্ব শৃঙ্খলা-পূর্ণ ছিল না, সুতরাং সকলে অক্ষুণ্ণভাবে আপনাদের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকলের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। মোগল-দিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, ভারতবর্ষে মুসলমান সেনাপতি ও মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের বিদ্রোহ, স্বাধীন হিন্দুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রধানতঃ এই তিন কারণে পাঠান-রাজত্বে নানা গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে এই গোলযোগ দূর হয়। আকবর, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় জাতির প্রতিই সমান আদর দেখাইয়া, একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা।—মুসলমান রাজারা প্রজাদের আবেদন লইয়া বিচার করিতেন বটে, কিন্তু সমুদয় রাজ-কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। অধিকাংশ স্থানের বিচার-কার্য্যের ভার কাজীদিগের উপরেই ছিল। প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা প্রজাদের নিকট কর আদায় করিতেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁহাদিগকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইত। সম্রাট এই সৈন্য লইয়া সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। যে শাসনকর্ত্তা নিয়মিতরূপে কর আদায় ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সম্রাট তাঁহার আধিপত্যের উপর কোন রূপে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মুসলমান সম্রাটেরা যথেচ্ছাচারী ছিলেন। প্রদেশের শাসনকর্ত্তারাও যথেচ্ছাচিতা দেখাইতেন। অপেক্ষাকৃত দূরতর প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা সেই সেই প্রদেশের

সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এইরূপ যথেচ্ছাচারিতা থাকিলেও পাঠান-রাজত্বে ভারতবর্ষের সুখসৌভাগ্য একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এই সময় প্রজাদের অন্নবস্ত্রের জন্য তাদৃশ ক্লেশ ছিল না। তাহারা অনেক সময়ে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সুতরাং তাহাদের অবস্থা বড় মন্দ ছিল না। তাহারা শান্তভাবে আপনাদের ভূমি কর্ষণ করিত। তাহাদেব মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রামের মণ্ডলেরা মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রজারা রাজার প্রাপ্য কর এই মণ্ডলের হাতে দিত। যুদ্ধের সময়েও ইহারা আপনাদের ব্যবসায় বন্ধ করিত না। এই সময় কেবল আপনাদের বাস-গ্রামগুলি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিত। বিলুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্ত সৈন্য উপস্থিত হইলে, আপনাদের সম্পত্তি ও গবাদি পশু ঐ প্রাচীরের মধ্যে রাখিত। সৈন্যগণ চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার শান্তভাবে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত হইত। শত্রুসৈন্য আসিয়া গ্রাম ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে ইহারা আপনাদের পরিবার ও গৃহপালিত পশু সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিত। যাবৎ আক্রমণকারী সৈন্য চলিয়া না যাইত, তাবৎ সেই গ্রাম পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিত। সৈন্যদল চলিয়া গেলে উহা আবার কৃষীবল দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। এই রূপে পাঠান-রাজত্বে কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয় নাই। রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিলেও কৃষকপল্লী ও কৃষীবল একবারে উৎসন্ন হইয়া যায় নাই।

এই সময় সংস্কৃত-চর্চ্চা বিলুপ্ত হয় নাই। মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনিয়া নবদ্বীপে

উঁহার অনুশীলন আরম্ভ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা হইতে লাহোর এবং দক্ষিণাপথ হইতে নেপাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের ছাত্রেরা নবদ্বীপে সংস্কৃত শিখিতে আসিত। এই সময়ে রূপসনাতন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব এই সময়ে হয় *।

পাঠান-রাজত্বে পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্য করিতে আইসে, এবং এই সময়ে মরহাট্টারা বিজয়নগর ও তাহার সমীপবর্ত্তী রাজ্য-সমূহে সামরিক কৌশল ও শূরত্ব অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে।

এই সময়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের বিলোপ হয় নাই। কালিকট একটি প্রধান বন্দর ছিল। এই স্থানে আরব,

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" নামক স্মৃতি-গ্রন্থের প্রণেতা। বঙ্গদেশে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এই গ্রন্থ-লিখিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়। রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামণিদীধিতি" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে মিথিলাবাসী প্রসন্নরাঘব-প্রণেতা জয়দেবকে (ইনি পক্ষধর মিশ্র নামে প্রসিদ্ধ) পরাস্ত করেন। রূপ ও সনাতন চৈতন্যের শিষ্য।

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলার ব্রাহ্মণকুলে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। ইঁহার রচিত "পদাবলীতে" হিন্দী কথার বাহুল্য দেখা যায়। বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী," "পুরুষপরীক্ষা" প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির সমকালে বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও ব্রাহ্মণ। চণ্ডীদাস প্রায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আবিসীনিয়া, ইউরোপ ও চীনদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থ সর্ব্বদা আগমন করিত।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।—পাঠান-রাজত্বে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যখন আপনাদের ধর্ম্ম-প্রচারে যত্নশীল হয়, তাহাদের মোল্লাগণ যখন চারি দিকে কোরাণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাকেন, তখন ভারতবর্ষীয়-দিগের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে। এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্ম্মবিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। রামানুজ প্রভৃতি কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি এই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থল-বিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

রামানুজ, ১১৫০ খ্রীঃ অব্দ।—খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্যের সহায়তায় শৈবদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথমে রামানুজ শৈব ধর্ম্মের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবল করিবার জন্য স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর নামক স্থানে রামানুজের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমিদেবী। রামানুজ কাঞ্চীপুরে শিক্ষালাভ করিয়া, অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানের নানা মতস্থ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া আপনার মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে বিষ্ণুই পরব্রহ্ম, এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। একমাত্র তাঁহার উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। রামানুজ ব্যঙ্কটগিরি (মান্দ্রাজের প্রায় ৬৩ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে; ইহা

ত্রিপতির পর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ) প্রভৃতি স্থানের শিব-মন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুর উপাসনার স্থান করেন। ত্রিচীনপল্লীর (ত্রিশির পল্লী) নিকট কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গ দ্বীপে উপনীত হইলে শৈব ও বৈষ্ণবে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে চোল রাজ্যের অধিপতি কৃমিকোণ্ড চোল, আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে মহাদেবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। রামানুজ এই আদেশ পালন না করাতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য অস্ত্রধারী লোক প্রেরিত হয়। রামানুজ আপনার শিষ্যবর্গের সহায়তায় অব্যাহতি পাইয়া মহীসূরের জৈন রাজা বেতাল দেব বেলাল রায়ের শরণাগত হন। তিনি এই রাজার পীড়িতা কন্যাকে নীরোগ করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। ক্রমে রামানুজ বেতাল দেবকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া আপনার মতাবলম্বী করেন। এই অবধি বেতাল দেবের নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন হয়। কয়েক বৎসর পরে চোল-রাজের মৃত্যু হয়। তখন রামানুজ আচার্য্য কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গ ধামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিরজীবন বৈষ্ণব ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। রামানুজ আচার্য্য সাত শত মঠ স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে চারিটি এখন বিদ্যমান আছে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্য নাম শ্রী-সম্প্রদায়। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পৃথক্ বা যুগল রূপের উপাসনা করেন। আবার কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ বা সীতারামেরও আরাধনা করিয়া থাকেন।

**রামানন্দ ১৩০০ খ্রীঃ অব্দ।**—রামানুজের পরে রামানন্দী অর্থাৎ রামাৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দের আবি-

র্ভাব হয়। রামানন্দ, রামানুজের পরম্পরাগত শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যথা, রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। রামানন্দ উত্তর ভারতবর্ষে আপনার মত প্রচার করেন। রামানন্দের মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ রামচন্দ্র ও তৎসহবর্ত্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করিয়া থাকেন। রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্রমে উত্তর ভাবতবর্ষের অনেক স্থানে রামানন্দের মত প্রচারিত হয়। রামানন্দ জাতিভেদ উচ্ছেদ পূর্ব্বক নীচ জাতীয় লোকদিগকেও শিষ্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে বার জন শিষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এলাহাবাদের পশ্চিমে গঙ্গা ও যমুনার সমীপস্থ প্রদেশে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই অধিক। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনাদের মত প্রচার করিতেন। প্রধানতঃ এই কারণে প্রচলিত হিন্দীভাষা পরিপুষ্ট হইয়াছে।

**কবীর, ১৩৮০-১৪২০।**— রামানন্দের বার জন শিষ্যের মধ্যে কবীরই অধিকতর প্রসিদ্ধ। রামানন্দ জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া, যে বাহ্য আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্নও রহিত করেন। তাঁহার মতে বাহ্য আড়ম্বর নিষ্ফল। কেবল একমাত্র অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন। অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সকলের আরাধ্য। হিন্দুর বেদ ও মুসলমানের কোরাণ, কিছুই অভ্রান্ত নহে। হিন্দুর ঈশ্বর ও মুসলমানের ঈশ্বর, উভয়েই এক। কবীর-পন্থীগণ বৈষ্ণব বলিয়া

উল্লিখিত হইলেও হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কোন দেবতার উপাসনা করা বা হিন্দু শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা অনাবশ্যক মনে করেন। কবীর-পন্থীদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে লিখিত আছে "আমরা আলি ও রাম, উভয়ের সন্তান। অতএব সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া করা আমাদের উচিত। * * ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত করা ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান ধর্ম্ম-নীতি, কারণ, মিথ্যা হইতেই যাবতীয় সাংসারিক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে।" ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগে কবীর-পন্থীদিগের অনেক লোক অবস্থিতি করে। ইহারা কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর্ম্ম-ব্রতী উদাসীন। সকলেই নিরীহ, নিরুপদ্রব ও নিষ্কপট। কথিত আছে, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ কবীর-পন্থীদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য একদা কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে কবীর-পন্থীদিগের ৩৫,০০০ উদাসীনের সমাগম হয়।

**মধ্বাচার্য্য, ১২০০ খ্রীঃ অব্দ।**—রামানুজের প্রবর্ত্তিত শ্রী-সম্প্রদায় ব্যতীত আর এক প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক। এজন্য এই সম্প্রদায় মধ্বাচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মধ্বাচারী সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় অপেক্ষা আধুনিক। ইহার প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলব দেশ-নিবাসী মধিজী ভট্টের পুত্র। মধ্বাচারীরা অপরাপর বৈষ্ণবদিগের ন্যায় বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের সহিত শৈবদিগের তাদৃশ

বিরোধ নাই। ইহাদের দেবালয়ে বিষ্ণু-মূর্ত্তির সহিত শিব, পার্ব্বতী ও গণেশের মূর্ত্তিও থাকে।

বল্লভাচার্য্য, ১৫২০ খ্রীঃ অব্দ।—শ্রী-সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পর তৃতীয় প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এজন্য লোক-সমাজে ইহা বল্লভাচারী নামে প্রসিদ্ধ। তৈলঙ্গ প্রদেশে বল্লভা-চার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণ ভট্ট। বল্লভাচার্য্য আপনার ধর্ম্ম-মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে গোকুলে (যমু-নার তীরবর্ত্তী মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে) যাইয়া বাস করেন। পরে ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। বল্লভাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের প্রয়োজন নাই, অন্নবস্ত্রের জন্য ক্লেশ পাইবার আবশ্যকতা নাই, এবং নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। তাঁহার মতে সুখসেবা বিষয় ভোগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বল্লভাচার্য্য এইরূপে ভোগ-বিলাসের অনুমোদন করিয়া শ্যাম-সুন্দর গোপালের উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

নিম্বাদিত্য।—চতুর্থ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এ নিমিত্ত ইহা নিমাৎ নামে প্রসিদ্ধ। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিমাৎদিগের উপাস্য দেবতা। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্র। পশ্চিমা-ঞ্চলের অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোক বাস করিয়া থাকে।

চৈতন্য, ১৪৮৫-১৫৩৩।—চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, শেষে গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবদ্বীপে

আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই স্থানে খ্রীঃ ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতন্যের মাতার নাম শচীদেবী। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী দৌহিত্রের নাম বিশ্বম্ভর রাখেন। চৈতন্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, এজন্য প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিত। অধিকন্তু অপদেবতার ভয়ে তাঁহার আর এক নাম নিমাই রাখা হইয়াছিল। চৈতন্যকে প্রথমে "বিশ্বম্ভর," "গৌরহরি" ও "নিমাই," এই তিন নামেই ডাকা হইত। যাহা হউক, চৈতন্য পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রথমে লক্ষ্মী নামে একটি রূপবতী কামিনীর সহিত বিশ্বম্ভরের বিবাহ হয়। কিছু দিন পরে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া নামে আর একটি কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই অবধি তাঁহার নাম চৈতন্য হয়। চৈতন্যের মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। ভক্তি ও শ্রদ্ধা-বলে সকল জাতির লোকই পবিত্র হইতে পারে। চৈতন্য মুসলমানকেও আপনার শিষ্য করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব ঈশ্বর-ভক্তি ও অপূর্ব্ব ঈশ্বর-প্রেম-দর্শনে অনেক পাষণ্ড ব্যক্তি আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছে। চৈতন্য উত্তরে বৃন্দাবন, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি সর্ব্বদা হরি প্রেমে মত্ত থাকিতেন। কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহি-

তেন না। খ্রীঃ ১৫৩৩ অব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

**নানক, ১৪৬৯-১৫৩৯।**—নানক শাহ অথবা বাবা নানক শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীঃ ১৪৬৯ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। নানকের পিতার নাম কালুবেদী। কালুবেদী ক্ষত্রিয়-বংশোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানক অল্প বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল হন। ক্রমে সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিরাগ জন্মে। তিনি যৌবনাবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আপনার মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। নানক সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা পর্য্যন্ত যাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সকল স্থানের সাধু, যোগী ও ফকীরদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া, নানক স্বদেশে আসিয়া গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে "কীর্ত্তিপুর" নামে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। এইখানেই খ্রীঃ ১৫৩৯ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। আত্ম-শুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। তাঁহার মতে বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। নানকের শিষ্যগণ শিখ নামে প্রসিদ্ধ। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে "শিখ" নাম হইয়াছে *।

* কেহ কেহ বলেন, শিখা হইতে "শিখ" নাম হইয়াছে। যে সকল পাঞ্জাবীর মস্তকে শিখা আছে, অনেকের মতে তাহারাই শিখ।

এই শিখগণ আপনাদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের যত্নে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হয়। শেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রতিভাবলে তাহারা মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠে।

স্বাধীন রাজ্য-সমূহের বিবরণ।—পাঠান-রাজত্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দু রাজারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। কোনও সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পাঠানের অধীন হয় নাই। কাশ্মীরে শৈব-মতাবলম্বী হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল। পাঠানেরা এখানে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে পারে নাই। তাহারা প্রথমে সিন্ধু হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত, এবং হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত প্রশস্ত ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে। রাজপুতনার মিবার, মাড়বার, বিকানের, যশলমীর প্রভৃতি হিন্দু রাজ্য আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও ঐ সকল রাজ্য স্বাধীনতা-বর্জ্জিত হয় নাই।

দক্ষিণাপথের হিন্দু-রাজ্য।—দক্ষিণাপথে মান্দ্রাজের দক্ষিণে দ্রাবিড়, দ্রাবিড়ের উত্তরে, পূর্ব্ব উপকূলে তৈলঙ্গ ও পশ্চিম উপকূলে কর্ণাট, এবং কর্ণাটের উত্তরে মহারাষ্ট্র, এই চারিটি প্রধান প্রদেশ ছিল। এই চারি প্রধান রাজ্যের অধিপতিরা খ্রীঃ ১২৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রদেশে পাণ্ড্য, চোল ও চের, এই তিনটি খণ্ডরাজ্য অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রাজধানী মাদুরা। এই রাজ্যে ক্রমান্বয়ে ১১৬ জন হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ খিলজীর সেনাপতি কাফুর পাণ্ড্য-

হিন্দুদের হস্তে সমর্পিত ছিল। হিন্দুরা রাজস্ব আদায় করিতেন, এবং উহা রাজকোষে জমা করিয়া দিতেন। ইহারা সেনাপতির পদেও অধিষ্ঠিত থাকিতেন। হিন্দু রাজারা যেমন মুসলমান-দিগকে সৈনিক-শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন, মুসলমান ভূপতি-রাও তেমনি হিন্দু-সৈন্য রাখিতেন। বাহমনী প্রভৃতি রাজ্যে আফগান ও হিন্দু-সৈন্য ছিল। বিজয়নগরের রাজা আফগান-দিগকে সৈনিক-শ্রেণীতে গ্রহণ করিতেন। সুতরাং মুসলমান-অধিকারে হিন্দুরা নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট ছিল না। অনেক হিন্দু সেনাপতি দেশ-বিজয়-কার্য্যে মুসলমান রাজাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, জায়গীর লাভ পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। দক্ষিণাপথের হিন্দুরা এই রূপে যুদ্ধ-কার্য্যে অভ্যস্ত থাকাতেই এক সময়ে মরহাট্টাদের পরাক্রম প্রকাশ পায়, এবং এক সময়ে শিবজী ইহাদের অধিনেতা হইয়া, আপনার ক্ষমতায় পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য কাঁপাইয়া তুলেন।

বাহমনী রাজ্যের অধঃপতন।—বাহমনী রাজ্যের সৈন্য-শ্রেণীতে শিয়া ও সুন্নী, এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। শেষে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের পরস্পর কলহে খ্রীঃ ১৪৮৯ ও খ্রীঃ ১৫২৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বাহমনী রাজ্যের অধঃ-পতন হয়।

দক্ষিণাপথের অন্যান্য মুসলমান-রাজ্য, ১৪৮৯-১৬৮৮। বাহমনী রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে এই পাঁচটি স্বাধীন মুসলমান-রাজ্যের উদ্ভব হয়।—(১) আদেলশাহী রাজ্য, রাজধানী বিজয়পুর, খ্রীঃ ১৪৮৯ অব্দে স্থাপিত হয়। খ্রীঃ ১৬৮৬-১৬৮৮ অব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব উহা অধিকার করেন।

(২) কোতবশাহী রাজ্য, রাজধানী গোলকুণ্ডা, খ্রীঃ ১৫১২ অব্দে স্থাপিত ও খ্রীঃ ১৬৮৭-১৬৮৮ অব্দে আওরঙ্গজের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। (৩) নিজামশাহী রাজ্য, রাজধানী অহমদনগর, ১৪৯০ অব্দে স্থাপিত ও শাহজহাঁ কর্ত্তৃক ১৬৩৬ অব্দে অধিকৃত হয়। (৪) বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য, রাজধানী ইলিচপুর, ১৪৮৪ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৫৭২ অব্দে অহমদনগর রাজ্যের (৩) সহিত সংযোজিত হইয়া যায়। (৫) বারিদশাহী রাজ্য, রাজধানী বিদর, ১৪৯২-১৪৮৯ অব্দে স্থাপিত হয়; আওরঙ্গজেব ১৬৫৭ অব্দে উহা অধিকার করেন।

বিজয়নগরের অধঃপতন।—মুসলমানেরা যখন পূর্ব্বোক্ত রাজ্য-সমূহে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন বিজয়-নগরে হিন্দুরাজা আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের কোন কোন মুসলমান ভূপতির আক্রমণে ঐ পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজ্য বিচলিত হয় নাই। শেষে মুসলমান ভূপতিগণ একত্র হইয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন। খ্রীঃ ১৫৬৫ অব্দে তেলিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের অধঃপতন হয়। এখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বল্লারী বিভাগে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে এই হিন্দু-রাজ্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিজয় নগরের জঙ্গলময় ভগ্ন অট্টালিকা, মন্দির ও দুর্গ প্রভৃতি এখন হিংস্র পশুসমূহের আবাস-ক্ষেত্র হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশ।—পাঠান-রাজত্বে খ্রীঃ ১৩৭১ অব্দে গুজরাটে মুসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হয়। গুজরাটের মুসলমান রাজা খ্রীঃ ১৫৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া-ছিলেন। মালবও একটি স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠে।

শেষে খ্রীঃ ১৫৩১ অব্দে ঐ রাজ্য গুজরাটের সহিত সংযোজিত হয়।

পাঠানদিগের রাজত্ব-সময়ে উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল। গঙ্গা-বংশীয় রাজারা অনেক রাজ্য আপনাদের অধীন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জয়পতাকা দক্ষিণাপথে উড্ডীন হইয়াছিল। উড়িষ্যা-বাসীরা স্থপতি-কার্য্যে আপনাদের বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। কনারকের মন্দির উড়িষ্যাবাসীদের শিল্প-চাতুরীর একটি প্রধান নিদর্শন।

এখন যে ভূখণ্ড বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইতেছে, মুসল-মান-রাজত্বের প্রারম্ভে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। কোন মণ্ডলে আর্য্য, কোন মণ্ডলে বা অনার্য্য জাতি প্রভুত্ব করিত। ক্রমে অনার্য্যেরা আর্য্যদের সহিত মিশিয়া গেল, তাঁহাদের ভাষা ও তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই রূপে সকল মণ্ডলগুলি একত্র হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল। এ স্থলে বলা উচিত যে, পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা এক সময়ে পদ্মা নদীর পশ্চিমে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিহুত, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া লইয়া ইহাদের একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যই প্রাচীন ভারতবর্ষে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ কহেন, বগুড়া জেলায় কর-তোয়ার তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্দ্ধনকুঠী নামে যে জন-পদ আছে, তাহাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পালরাজারা মগধেও আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। ইহারা আপনা-দিগকে গৌড়ের অধিপতি বলিতেন। এ দিকে নদিয়া ও বিক্রম-পুরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় সেনরাজারা প্রবল ছিলেন।

যখন সেনরাজারা অধিকতর ক্ষমতাশালী হন, তখন পালবংশীয় রাজারা গৌড় পরিত্যাগ করিয়া মগধে বা মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই দুই বংশের রাজারা এক সময়েই বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশ শাসন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ইহাদের অধীন হইয়াছিল, কিন্তু ইঁহারা সমস্ত বাঙ্গালা একচ্ছত্র করেন নাই। যাহা হউক, বখ্‌তিয়ার খিলিজী সমগ্র বাঙ্গালা পরাজয়ে সমর্থ হন নাই। তিনি কেবল নদিয়া ও বাঙ্গালার উত্তর পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিলেন মাত্র। পাঠানেরা গৌড়ের অধিপতি হইয়াও সমগ্র বাঙ্গালা আপনাদের অধীন করিতে পারেন নাই। যখন পাঠান-রাজত্বের শেষ হয়, তখনও বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল স্বাধীন ছিল। "পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, আরাকাণরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল, এবং উত্তরে কোচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল।" মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বে কামরূপ এক সময়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আসাম, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি উহার অন্তর্গত ছিল।

বাবর যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ ছিল। এই সকল বিচ্ছিন্ন খণ্ডরাজ্যের উপর তিনি একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

**বাবরের পূর্ব্বতন অবস্থা।**—বাবরের পূর্ব্বতন অবস্থার বিবরণ অনেক বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিমুরলঙ্গের বংশোদ্ভব আবু সৈয়দ আপন রাজ্য, পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া

লেন। এই বিভাগ অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র অহম্মদ মির্জ্জা সমরকন্দ ও বুখারা রাজ্য, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ মির্জ্জা বল্‌থ্‌ রাজ্য, তৃতীয় পুত্র অলকবেগ কাবুল রাজ্য এবং চতুর্থ পুত্র ওমর সেখ মির্জ্জা ফরগণা রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই ওমর সেথ মির্জ্জা বাবরের পিতা। রাজ্য-প্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ওমর সেখের মনান্তর হওয়াতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ শেষ না হইতে হইতেই ওমর লোকান্তরিত হন। এই সময় বাবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর।

বাবর এই তরুণ বয়সে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরে জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু হইল। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধের বিরাম হইল না। তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত মহম্মদ মির্জ্জা সমরকন্দ অধিকার করিয়া রণ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহারও পরলোক প্রাপ্তি হইল। এই সুযোগে বাবর সমরকন্দ অধিকারের সঙ্কল্প করেন। তিনি তিন বার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; চতুর্থ বার তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বাবর সমরকন্দ অধিকার করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পনর বৎসর।

বাবরের যেমন সাহস ও বীরত্ব ছিল, তেমন সৈনিক বল ও যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং তিনি দুই দিক রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। সমরকন্দ অধিকারের পর তথায় কিছু দিন রাজত্ব করিতে না করিতেই তম্বল নামক তাঁহার এক জন সেনাপতি তাঁহার নিজ রাজ্য ফরগণা অধিকার করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া বাবর অবিলম্বে ফরগণায় যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার এমন উৎকট পীড়া হইল যে, রক্ষা পাওয়া

দুর্বল হইয়া উঠিল। তিনি এই রোগ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট-চক্র নিম্নগামী হইল। তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার গমনের পর সমরকন্দ-বাসীরা ঐ রাজ্য শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

বাবর এইরূপে ফরগণা ও সমরকন্দ, উভয় রাজ্য হারাইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ভঙ্গ হইল না। তিনি কিছু কাল মাতুলের আলয়ে থাকিলেন, এবং শেষে এই মাতুলের সাহায্যে ফরগণা রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন।

ইহার পর সমরকন্দের অধিবাসিগণ তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া, সেই রাজ্য তাঁহার হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। বাবর ঐ পত্র পাইয়া সমরকন্দে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত না হইতে হইতেই শুনিলেন, ইউজ্‌বেক জাতি সমরকন্দ ও বুখারা, উভয় রাজ্যই অধিকার করিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বতন সেনাপতি তম্বল পুনর্ব্বার ফরগণা অধিকার করিলেন। বাবর পুনর্ব্বার দুই দিক হারাইয়া স্বীয় রাজ্যের দক্ষিণাংশের পর্ব্বত-শিখরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ইউজবেকদিগের সেনাপতি যুদ্ধার্থ স্থানান্তরে গমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বাবর ২৪০ জন মাত্র লোকের সহিত সমরকন্দে উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রিকালে প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিয়া প্রহরীদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। নগর অধিকৃত হইল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষদিগের ধন-

তাতার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইলেন; এই সময়ে বিপক্ষেরা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল; বাবর দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় লইলেন। পরিশেষে আহারীয় দ্রব্যের অভাবে তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

ইহার পর দুই বৎসর অতি ক্লেশে অতিবাহিত হয়। ক্লেশ ক্রমে অসহ্য বোধ হওয়াতে বাবর চীন দেশে যাইয়া কোনও রূপে দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। কিছু কাল প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, বাবর মাতুলের সাহায্যে আবার ফরগণা রাজ্য অধিকার করেন।

এদিকে তম্বল ইউজবেকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফরগণা আক্রমণ করেন। বাবর অতিশয় সাহস-সহকারে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষে পরাজিত ও বন্দী হন।

কিছু কাল পরে শত্রু-হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাবর প্রিয়তম ফরগণা রাজ্যের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্‌খে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত ৩০০ মাত্র লোক ও দুইটি বস্ত্রাবাস ছিল। এক বস্ত্রাবাসের একটিতে আপনি ও অপরটিতে তাঁহার জননী থাকিতেন।

বল্‌খের লোকে বাবরের সৌজন্যে বশীভূত হইল। বাবর ইহাদের সাহায্যে কাবুল অধিকার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসরের অধিক হয় নাই।

কাবুল অধিকারের পর পঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তা দৌলত খাঁ বাবরকে ভারতবর্ষে আহ্বান করেন। বাবর এই প্রার্থনা অনুসারে পানিপথের যুদ্ধে জয়ী হইয়া যেরূপে দিল্লীর অধিকারী হন,

তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বাবরের মাতা মোগলজাতীয়া। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ মোগল বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

---

## মোগলদিগের রাজত্ব, ১৫২৬-১৭৬১।

### বাবর, ১৫২৬-১৫৩০।

জহির উদ্দীন মহম্মদ বাবর বাদশাহ দিল্লী অধিকার করিয়া, আহ্লাদের সহিত মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার এ আহ্লাদের সময়েও চিন্তা দূর হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনেক সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্র করিতেছে। এজন্য তিনি অবিলম্বে সমুদয় সৈন্য একত্র করিলেন, এবং তাহাদিগকে জানাইলেন, যাহাদের ইচ্ছা হয়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে. তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। ইহাতে অনেক সৈন্য লজ্জিত হইল, এবং অনেকে আপনাদের অধিনায়কের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল।

বাবর আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে সেনাপতি করিলেন। এব্রাহিম লোদীর রাজত্ব-কালে যে সমস্ত স্থান দিল্লীর অধীন ছিল, হুমায়ুন চারি মাসের মধ্যে তৎসমুদয় পুনরধিকার করিলেন।

**ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধ, ১৫২৭।**—পরবর্ত্তী বৎসর

মিবারের অধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। সংগ্রামসিংহ সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন, তিনি আজমীঢ় ও মালব অধিকার করিয়াছিলেন এবং মাড়বার ও জয়পুর-রাজকে বশে আনিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহ অবিলম্বে আগ্রার নিকটবর্ত্তী বিয়ানা অধিকার পূর্ব্বক বাবরের এক দল সৈন্যকে পরাভূত করিলেন। ইহাতে হিন্দু ও মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, আগ্রার নিকটবর্ত্তী ফতেপুর সিক্রিতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশে শুচি ও সংযত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিহার করিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুদ্ধের দিন বাবর গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিলেন। বাবরের বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া সৈন্যগণ সাহস-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ ইহাদের বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। রাণা পলায়ন করিলেন, তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল, বাবর বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধে বাবরের ক্ষমতা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। সিক্রির যুদ্ধে গোলা ও তীর, উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী ছয় মাস অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে পর্য্যবসিত হয়। ইহার পর বাবর আবার রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে মুলতান হইতে বিহার পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইল।

**বাবরের মৃত্যু ১৫৩০।**—এই সকল দেশ-জয়-প্রসঙ্গে বাবর স্থানান্তরে ছিলেন; শেষে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখি-

লেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তনয়ের সাংঘাতিক পীড়া দেখিয়া, দুশ্চিন্তায় তিনি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হুমায়ুন ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাবর আর সুস্থ হইতে পারিলেন না, প্রচণ্ড জ্বরে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন (২৬এ ডিসেম্বর)। তাঁহার দেহ মহা আড়ম্বরে তাঁহার মনোনীত স্থান কাবুলে সমাহিত হইল। এই সমাধি স্থান সাতিশয় মনোহর ও গম্ভীর ভাবের উদ্দীপক। ইহার নিকট একটী স্বচ্ছসলিলা সরিৎ প্রবাহিত হইতেছে। সমাধি-মন্দির শ্বেত মার্ব্বলে সংগঠিত। অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে ইহা অতিশয় রমণীয় দেখায়। বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার শোভা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বাবরের চরিত্র।—বাবরের চরিত্র অতি সুন্দর। তাঁহার অনেকগুলি গুণ ছিল। অনেক মুসলমান রাজার এই সমস্ত গুণ লক্ষিত হয় না। তাঁহার সাহস অতুল্য ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। নদী পার হইবার সময় তিনি জলযানে আরোহণ করিতেন না, প্রায়ই সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন। বাবর কেবল সংগ্রামে পণ্ডিত ছিলেন না, সঙ্গীত-শাস্ত্রেও তাঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। পারশী ভাষায় তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজত্ব-কাল হইতে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, যে দিবস যে যে ঘটনা হইয়াছিল, যে স্থানে যে ভাবে তিনি কাল যাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিস্তারিত রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। বাবর সরলস্বভাব, দানশীল ও সদালাপী ছিলেন; সর্ব্বদা যুদ্ধে

তাঁহার নিজের শরীরও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি দেশের হিতজনক কোন কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই, কেবল কতকগুলি পান্থশালা ও জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাবর অতিশয় মদ্য পান করিতেন। এই দোষ তিনি পরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অতিপান-দোষেই তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

---

## হুমায়ুন, প্রথম রাজত্ব, ১৫৩০-১৫৪০।

বাবরের চারিপুত্র,—হুমায়ুন, কামরান, হেন্দাল ও মির্জ্জা আস্করী। হুমায়ুন পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নসিরউদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুন বাদশাহ। অন্তর্ব্বিদ্রোহের আশঙ্কায় হুমায়ুন, কামরানকে কাবুল সমর্পণ করিলেন, হেন্দালকে সম্বলের অধিকারী করিলেন এবং মির্জ্জা আস্করীকে মেওয়াতে রাজ্য দিলেন। কেবল হিন্দুস্তান তাঁহার নিজের রহিল।

হুমায়ুনের প্রথম কার্য্য।—হুমায়ুন প্রথমে জৌনপুরের বিদ্রোহনিবারণে মনোনিবেশ করেন। ইহার পর গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। বাহাদুর শাহ বাবরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। পাঁচ বৎসর কাল হুমায়ুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, শেষে বাহাদুর পরাজিত হন। হুমায়ুন চাম্পানেরের দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ অধিকারে হুমায়ুন কৌশল ও সাহসের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চাম্পানেরের দুর্গ পর্ব্বতের শিখর-দেশে অবস্থিত। উহার

দ্বার রুদ্ধ হইলে আরোহণ করা কঠিন। হুমায়ুন রাত্রিকালে কতকগুলি সৈন্যকে দুর্গ-দ্বার আক্রমণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে দুর্গ-রক্ষক সৈন্য দ্বাররক্ষার্থ গমন করিল। হুমায়ুন এই সুযোগে তিন শত সৈন্য লইয়া দুর্গপ্রাচীরে লৌহ-কীলক প্রোথিত করিয়া উপরে উঠিলেন, এবং দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে একবারে আক্রমণ করিলেন। দুর্গ সহজেই অধিকৃত হইল।

শের শাহের সহিত যুদ্ধ।—কিন্তু হুমায়ুন দীর্ঘকাল গুজরাট আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। শের খাঁ বাঙ্গালায়, বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, হুমায়ুন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই অবসরে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরধিকার ও মালব আক্রমণ করেন (১৫৩৭)।

শের শাহ।—শের খাঁ সাধারণতঃ শের শাহ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি পাঠান বংশোদ্ভব। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম ফরিদ খাঁ শূর। স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করাতে তিনি "শের" নাম গ্রহণ করেন। শের শব্দের অর্থ ব্যাঘ্র। শের সাহ পিতৃকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জৌনপুরের রাজার সৈন্য- দলে প্রবেশ করেন, কিন্তু এই সামান্য চাকরি তাঁহার বিরক্তিকর হইয়া উঠাতে তিনি আপনার বাসস্থান দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লোদী বংশের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত শের এই স্থানে অবস্থিতি করেন। ১৫২৭ অব্দে তিনি বাবরের সৈন্য-দলে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে শেরের সাহস ও ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠে। এজন্য সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া বিহার আক্রমণ-কালে তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে মহম্মদ লোদী বিহার গ্রহণ

করিয়ে শের মহম্মদের সহিত মিলিত হন। মহম্মদ লোদীর মৃত্যুর পর শের বিহারে আধিপত্য প্রসারিত করেন। ১৫৩২ অব্দে হুমায়ুন যখন গুজরাটের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, শের তখন বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হন। হুমায়ুন এজন্য ১৫৩৭ অব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

চুণার দুর্গ শের খাঁর অধিকৃত ছিল। হুমায়ুন এই দুর্গ অবরোধ করেন; ছয় মাসের পর দুর্গ অধিকৃত হয়। শের এজন্য স্বীয় সম্পত্তি ও পরিবার রোটস দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় প্রবল বর্ষা হইয়াছিল, সুতরাং হুমায়ুন কোন রূপ আশঙ্কা না করিয়া আপনার সৈন্য শিবিরে সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু শের খাঁ অকর্ম্মণ্য থাকিবার লোক নহেন, তিনি অকস্মাৎ চুণার, বারাণসী ও কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন।

**শের খাঁর সহিত যুদ্ধ, ১৫৩৯।**—শীতকালে হুমায়ুন শের খাঁর সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু পীড়ায় তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা অল্প হইয়া পড়াতে তিনি আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শের ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলেন। হুমায়ুন একদা গঙ্গার তটে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন, ক্ষিপ্রকর্ম্মা শের ঐ সময় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে হুমায়ুনের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ পলায়িত হইল, হুমায়ুন স্বয়ং গঙ্গায় পড়িলেন, ভাগ্যক্রমে এ যাত্রা তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। শের খাঁ ইহার পর বাঙ্গালা আক্রমণ করেন।

**হুমায়ুনের পুনর্ব্বার পরাজয় ও পলায়ন, ১৫৪০**—হুমায়ুন কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু তিনি

পুনর্ব্বার পরাজিত হন, এবং পুনর্ব্বার গঙ্গায় পতিত হইয়া ঘটনাক্রমে প্রাণ রক্ষা করেন। ইহার পর হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হন, এবং শেষে আগ্রা ও দিল্লী উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-বর্গের সহিত লাহোরে প্রস্থান করেন।

শের খাঁর পশ্চাদ্ধাবন।—শের খাঁ সম্রাটের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া লাহোরে উপস্থিত হন, সম্রাট ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া সিন্ধুতে পলায়ন করেন। এ স্থানেও তাঁহার আশা ফলবতী হয় না। হুমায়ুন অতঃপর যোধপুরের রাণা মালদেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু মালদেব আশ্রয় দিতে অসম্মত হওয়াতে সম্রাট উপায়ান্তর অভাবে মরুভূমি অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার ও তদীয় অনুচরবর্গের কষ্টের একশেষ হয়। অনেকে আহারীয় ও পানীয়ের অভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে।

আকবরের জন্ম, ১৫৪২।—এইরূপ অসহনীয় কষ্ট ভোগের পর হুমায়ুন কতিপয় অনুচরের সহিত অমরকোটে উপস্থিত হন। এই স্থানে তাঁহার প্রণয়িণী হামিদা বানুর গর্ভে আকবরের জন্ম হয়। আকবর মরু-প্রান্তবর্ত্তী একটী সামান্য স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এই সময়ে কোন রূপ উৎসব বা কোন রূপ আমোদ হয় নাই। শেষে এই বালক ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ হইয়া আপনার অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং অনন্ত উৎসবে ও আমোদে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন অমরকোটে আশ্রয় পাইয়া তথাকার রাজার সভায় দেড় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

পারস্যে প্রস্থান।—হুমায়ুন সিন্ধু অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহার পর তিনি কান্দাহারে যাইতে উদ্যত হন, কিন্তু সেই রাজ্য তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা আস্করীর অধীন ছিল, আস্করী অগ্রজকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। এজন্য হুমায়ুন পারস্যের অন্তর্বর্ত্তী হিরাটে প্রস্থান করেন।

শূর বংশ।—এদিকে শের খাঁ "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার বংশ "শূর" নামে প্রসিদ্ধ।

শের শাহ, ১৫৪০-১৫৪৫।—শের শাহ হুমায়ুনের অধীনস্থ সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া মালব, রাইসিন ও মাড়বার জয় করেন। ইহার পর চিতোর অধিকার করিতে উদ্যত হন। তিনি যখন এই স্থানে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তখন গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শের শাহের মৃতদেহ বিহারের অন্তঃপাতী সাসিরামে সমাহিত হয়। সেই স্থানে তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। একটি রমণীয় ঝিল এই মন্দিরের চারি দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহা সমাধি-মন্দিরের শোভার জন্য খনিত হইয়াছিল।

শের শাহের চরিত্র।—শের শাহ বীর পুরুষ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় ক্ষমতা-বলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু রাজ্য বৃদ্ধি করা তাঁহার একটা রোগ ছিল। এই রোগ কিছুতেই নিবারিত হয় নাই। শের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতকতা পর্য্যন্তও

করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দোষ থাকিলেও শের শাহের গুণের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। তিনি সদয় ও প্রজা-হিতৈষী ছিলেন। শের পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আদেশে বাঙ্গালা হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হয়। এই পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ-শ্রেণী রোপিত হইয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্য সমেত পান্থ-শালা ছিল। দুঃখী পথিকেরা বিনা ব্যয়ে এই স্থানে আহারীয় পাইত। এতদ্ব্যতীত পথের এক এক ক্রোশ অন্তরে কূপ ও মস্‌জিদ ছিল। শের শাহ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টিকর্ত্তা। লোকে ইহাতে সংবাদাদি শীঘ্র পাইত। তাঁহার অধিকারে দস্যু-বৃত্তি নিবারিত হইয়াছিল। পথিকেরা অকুতোভয়ে রাজ-পথে দ্রব্যাদি রাখিয়া নিদ্রা যাইত, কেহ ঐ সকল দ্রব্য স্পর্শ করিত না।

**শের শাহের রাজস্ব-নিয়ম।**—শের শাহ উৎপন্ন রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। আকবরের বিখ্যাত রাজস্ব-মন্ত্রী তোড়রমল শের শাহের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

**সলিম শাহ্ শূর, ১৫৪৫-১৫৫৩।**—শেরের কনিষ্ঠ পুত্র জেলাল খাঁ "সলিম শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেল শাহ সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়িত হন। সলিমের অবশিষ্ট রাজত্ব-কাল নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়।

**মহম্মদ শাহ শূর আদেল, ১৫৫৩-১৫৫৫।—** সলিম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় শ্যালক মহম্মদ আদেল শাহ সলিমের পুত্র ফিরোজ শাহকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আদেল সাতিশয় অব্যবস্থিত ও অদূরদর্শী ছিলেন। তিনি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ও আমোদপ্রমোদেই মত্ত হইলেন। শীঘ্র ইহার বিষময় ফল উপস্থিত হইল। এই বংশীয় এব্রাহিম শূর বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই অহম্মদ নামক শের সাহের একজন ভ্রাতৃপুত্র সেকন্দর শাহ নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীতে আসিয়া এব্রাহিমকে তাড়াইয়া দিলেন। পঞ্জাব, বাঙ্গালা ও মালব পুনর্ব্বার স্বাধীন হইল। হিমু নামক হিন্দুজাতীয় এক ব্যক্তি মহম্মদ সাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রভুর রাজ্যরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় বার রাজত্ব, ১৫৫৫-১৫৫৬।— হুমায়ুন এই গোলযোগের সংবাদ পাইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কাবুল হইতে তাঁহার সিংহাসন গ্রহণার্থ সমাগত হইলেন।

হুমায়ুন পারস্য দেশে সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। পারস্যের অধিপতি শাহ তমাস্প সিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন, এজন্য তিনি হুমায়ুনকে সুন্নি মত পরিত্যাগ করিয়া এই মত গ্রহণ করিতে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তমাস্প নির্ব্বাসিত সম্রাটকে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন (১৫৪৫)। এই সাহায্যে হুমায়ুন আফগানিস্তানে আসিয়া মির্জ্জা আস্করীর নিকট হইতে কান্দাহার গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ

মির্জ্জা আস্করীকে হত্যা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুন সৌজন্য ও ভ্রাতৃ-প্রণয় দেখাইয়া ভ্রাতাকে ক্ষমা করেন। ইহার পর তিনি কাবুল অধিকার করেন, এই স্থানে হেন্দাল তাঁহার সহিত মিলিত হন। কামরান বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুন তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করাতে তিনিও হুমায়ুনের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে হুমায়ুনের উদারতায় ও সৌজন্যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। চারি ভ্রাতা এইরূপে একত্র হইয়া বংশের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব উদ্ধারার্থ যত্নপর হইলেন। কিন্তু কামরানের অদৃষ্টে ভ্রাতৃ-প্রণয়সুখ দীর্ঘকাল থাকে নাই। তিনি নিজের অব্যবস্থিততার পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হন; হুমায়ুন তাঁহাকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। ইহার পর কামরান আবার বিদ্রোহী হওয়াতে হুমায়ুন এই শেষ বার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন।

**হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ, ১৫৫৬।**—জানুয়ারি মাসে হুমায়ুন কাবুল হইতে যাত্রা করেন। তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা সহজেই অধিকার-ভুক্ত করিয়া তুলেন। এই বৎসরের জুলাই মাসে তিনি মহাসমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

**হুমায়ুনের মৃত্যু, ১৫৫৬।**—কিন্তু হুমায়ুন দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি ঘটনা-ক্রমে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

**হুমায়ুনের চরিত্র।**—হুমায়ুন সচ্চরিত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া যেমন কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, অপরের অদৃষ্টে তেমন কষ্ট ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার হৃদয় সরল ও সদয় ছিল। কিন্তু সর্ব্বদা শত্রুসমূহে পরিবেষ্টিত থাকাতে তিনি শেষে কখন কখন দয়ার বহির্ভূত কার্য্য করতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। হুমায়ুন ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল নির্ব্বাসিত হইয়া নানা স্থানে বেড়াইয়াছিলেন, ১০ বৎসর মাত্র রাজত্বসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

## আকবর, ১৫৫৬-১৬০৫।

হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবর পিতৃমন্ত্রী বৈরাম খাঁর সহিত পঞ্জাবে ছিলেন। এক্ষণে অবিলম্বে দিল্লীতে আনীত হইলেন। এই সময়ে আকবরের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

**বৈরাম খাঁ।**—আকবর অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাতে রাজমন্ত্রী বৈরাম বিশ্বস্ততার সহিত সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন দিল্লীতে থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের শৃঙ্খলা করিতেছিলেন, তখন বদক্ষাণের অধিপতি মির্জ্জা সোলেমান কাবুল অধিকার করেন, এবং মহম্মদ সাহ শূর আদেলের মন্ত্রী হিমু মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন।

**পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬।**—হিমু বসন্তরায় নামেও প্রসিদ্ধ। রণ-পাণ্ডিত্য ও রাজ্যশাসনে ইহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। হিমু আগ্রা অধিকার করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। এই সময়ে বৈরাম তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

করেন। পানিপথে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হন। তরুণবয়স্ক আকবর এই যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিলক্ষণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

**আকবরের রাজ্যভার গ্রহণ, ১৫৬০।**—দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৈরাম সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, রাজধানীতে গুপ্ত হত্যা-কাণ্ডও চলিতে লাগিল। আকবর এই সমস্ত কারণে বিরক্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন।

**বৈরামের মৃত্যু।**—বৈরাম নাগোরে যাত্রা করিলে আকবর তাঁহার পদচ্যুতির সংবাদ প্রকাশ্যরূপে বিজ্ঞাপিত করেন। বৈরাম ইহাতে বিদ্রোহী হন, আকবব সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। তিনি পরাজিত মন্ত্রীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। বৈরাম অতঃপর মক্কায় যাইবার অভিলাষ জানান। আকবরও ইহাতে সম্মত হন। বৈরাম খাঁ গুজরাটে যাইয়া অভীষ্ট তীর্থে যাইবার জন্য জাহাজে আবোহণের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন পাঠান তাঁহাকে হত্যা করে। পূর্ব্বে এই ব্যক্তির পিতা বৈরামের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

সুলতান জালাল উদ্দীন মহম্মদ আকবর এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মোগলদিগের প্রাদুর্ভাব-সময়ে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গুজরাট, মালব, রাজপুত রাজ্য প্রভৃতি, সর্ব্বত্রই স্বাধীন রাজা ছিলেন। দক্ষিণাপথেও অনেকগুলি

রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। আকবর রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত রাজ্য দিল্লীর শাসনাধীন করিতে উদ্যত হন। তাঁহার এই উদ্যম সফল হইয়াছিল। ১৫৫৬ অব্দে যখন তিনি পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হন, তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলি স্বপ্রধান খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, শেষে তিনি ভারতবর্ষকে একটি সুব্যবস্থিত সম্রাজ্যে পরিণত করিয়া ১৬০৫ অব্দে পরলোকগত হন। আকবর কোথাও যুদ্ধ করিয়া, কোথাও বা সরলতা ও সহৃদয়তা দেখাইয়া ভারতের প্রধান প্রধান জাতিকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজপুত ভূপতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার যত্নে হিন্দুগণ প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হন। এইরূপ সমদর্শিতার গুণে আকবরের রাজ্য বদ্ধমূল হয়।

রাজপুত রাজ্য, ১৫৬১-১৫৬৮।—রাজপুত রাজ্য আকবরের প্রধান লক্ষ্য হন। আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোরের তদানীন্তন রাজা শান্ত ও নিরীহস্বভাব ছিলেন। তিনি যুদ্ধ না করিয়া জয়মল্ল নামক এক জন পরাক্রান্ত সেনাপতির হস্তে নগর-রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অপসৃত হন। জয়মল্ল আকবরের প্রথম আক্রমণ নিস্ফল করেন। কিন্তু একদা রাত্রিকালে আকবর তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া গুলির আঘাতে বধ করেন। ইহাতে রাজপুতগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। মহিলাগণ শিশুসন্তানের সহিত অনল-কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, এবং পুরুষগণ তরবারি হস্তে করিয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের ন্যায় রণশায়ী হয়। আকবর নিজের কৃতকার্য্যতার পরিমাণার্থ নিহত রাজপুতগণের যজ্ঞসূত্র ওজন করিয়াছিলেন। ওজনে উহা ৭৪॥০

মণ হইয়াছিল। এক্ষণে পত্রের পৃষ্ঠে ৭৪॥০ লিখিবার রীতি আছে। ইহার অর্থ এই, পত্রের শিরোনামে যাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি ব্যতীত যিনি পত্র খুলিবেন, তাঁহার উপর চিতোর-ধ্বংসের সমস্ত পাপ বর্ত্তিবে।

আকবর অন্য উপায়েও অনেক রাজপুতকে বশীভূত করেন। রাজপুত ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনই এই উপায়। সম্রাট স্বয়ং জয়পুর ও মাড়বার-রাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং জয়পুরের রাজপরিবারের আর এক কন্যার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। ইহাতে ঐ সকল রাজপুত রাজা-দিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হয়।

প্রতাপ সিংহ—কিন্তু চিতোর-রাজ উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ কখনও আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, এবং কখনও বিধর্ম্মীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিতে উন্মুখ হন নাই। উদয় সিংহ আরাবলী পর্ব্বতের নিকটে উদয়পুর নামে একটি নগর স্থাপন করেন। চিতোর-ধ্বংসের চারি বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ সিংহ স্বীয় বংশের গৌরব রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

হলদীঘাটের যুদ্ধ, ১৫৭৬।—মোগলদিগের সহিত আম্বেরের অধিপতি মানসিংহের বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকাতে প্রতাপসিংহ রাজা মানের সহিত একত্র আহার করিতে অসম্মত হন। ইহাতে মানসিংহ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া আকবরকে সমুদায় বিবরণ জানান। আকবর প্রতাপ

সিংহকে বশীভূত করিবার জন্য মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর অধীনে বহুসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপ ২২ হাজার সাহসী রাজপুতের সহিত হলদীঘাট নামক গিরিসঙ্কটে ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই স্থানে প্রতাপের পরাজয় ও মোগলদের জয় হয়। ১৪ হাজার রাজপুত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করে।

**হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাবস্থাপন।**—আকবরের উদারতা ও সমদর্শিতাগুণে প্রধান প্রধান হিন্দুরাজ্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপিত হয়। আকবর জয়পুর-রাজের পুত্রকে পঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তা করেন। রাজা মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৫৯৮ হইতে ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজা তোড়রমল আকবরের প্রধান রাজস্ব মন্ত্রী এবং রাজা বীরবল রাজকার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ৪১৫ জন সেনাপতি, অশ্বারোহী সৈন্যগণের অধ্যক্ষতা করিতেন। ইহাদের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু। আকবর 'জিজিয়া' কর রহিত করেন। এই কর মুসলমান ব্যতীত আর সকলকেই দিতে হইত। তাঁহার যত্নে সংস্কৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি পারশ্যভাষায় অনুবাদিত হয়। তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুশাসনের সম্মান করিতেন। তাঁহার নিকট হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তুল্য ছিল।

**দুর্গাবতী।**—এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী গড়মণ্ডলে দুর্গাবতী রাজত্ব করিতেন। ইনি সাতিশয় যশস্বিনী ও বীর্য্যবতী

মহিলা ছিলেন। ১৫৬৪ অব্দে আকবরের সেনাপতি আসফখাঁ ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করেন। প্রথম দুই যুদ্ধে আসফের পরাজয় হয়। কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে দুর্গাবতীর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। দুর্গাবতী আপনাকে পরাজিত দেখিয়া বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গড়-রাজ্যের অনেক অর্থ আসফের হস্তগত হয়। আজ পর্য্যন্ত বুন্দেল-খণ্ডের সূতগণ দুর্গাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গান করিয়া বেড়ায়।

মুসলমান-রাজ্য অধিকার।—আকবর হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, প্রধানতঃ এই হিন্দুদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের মুসলমান খণ্ডরাজ্যগুলি অধিকার করিতে উদ্যত হন। পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অধিকৃত হয়। শের শাহের বংশীয় আফগান ভূপতিগণ বাঙ্গালার আধিপত্য করিতেছিলেন। ১৫৭৪ অব্দে তাঁহাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। বাঙ্গালা মোগলসাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। ১৫৭৪ অব্দে রাজা তোড়রমল উড়িষ্যা অধিকার করেন। গুজরাটে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তথাকার শাসনকর্ত্তা এতমাদ খাঁ আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিমুরলঙ্গের বংশের মির্জ্জারাই ঐ অন্তর্বিদ্রোহের সূত্রপাত-কর্ত্তা। আকবর স্বয়ং ইঁহাদের বিরুদ্ধে যাইয়া ইঁহাদিগকে পরাজিত ও গুজরাট হস্তগত করেন (১৫৭২)। মালবও এই সময়ে দিল্লীর অধিকার-ভুক্ত হয়। ১৫৮৭ অব্দে কাশ্মীরে আকবরের জয়পতাকা উড্ডীন হয়। আকবরের ভ্রাতা হাকিম কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮২ অব্দে তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করিলে আকবর তাঁহাকে পঞ্জাব হইতে দূরীভূত করিয়া কাবুল অধিকার

করেন। ইহার পর হাকিম ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আকবর তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে কাবুলে পুনঃস্থাপন করেন। অনন্তর আকবর ১৫৯২ অব্দে সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে পারস্যের অধিপতি কান্দাহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবর ১৫৯৪ অব্দে ঐ স্থানও আপনার অধিকার-ভুক্ত করেন। এইরূপে ১৫৯৪ অব্দে আফগানিস্তান হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত আকবরের জয়-পতাকা উড্ডীন হয়। আকবর দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৬৬ অব্দে আগ্রার দুর্গ তাঁহার যত্নে নির্ম্মিত হয়।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যুদ্ধ।—ইউসফজী নামক আফগান জাতির সহিত আকবরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহারা কাবুলে উৎপাত আরম্ভ করাতে আকবর রাজা বীরবল ও জৈনখাঁর অধীনে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। বীরবলের সৈন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলে আফগানেরা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়। এজন্য জৈনখাঁ তাহাদের সাহায্যার্থ উপনীত হন। এই উভয় সৈন্যদলই একদা রাত্রিকালে আক্রান্ত হয়। বীরবল সৈন্যগণের সহিত রণশায়ী হন। জৈনখাঁর অধীনস্থ সৈন্যদল পলাইয়া আটকে আইসে। এই সংবাদে আকবর অবিলম্বে আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া আফগানদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে দূরীভূত করেন।

দক্ষিণাপথের যুদ্ধ।—আকবর এক্ষণে দক্ষিণাপথে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে অহমদনগরে গোলযোগ

আরম্ভ হইয়াছিল; আকবর এই সুযোগে ঐ নগর হস্তগত করিতে উদ্যত হন।

**চাঁদ সুলতানা।**—১৫৯৯ অব্দে আকবর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ মোরাদ এবং মির্জ্জাখাঁর আধীনে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। চাঁদ সুলতানা অহমদনগরের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। সাহসে ও বীরত্বে এই নারী ভারতের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি মোগল সৈন্য প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন, বন্দুকে নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত পূরিয়া তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মোগলেরা এই বীরাঙ্গনার লোকাতীত সাহস দর্শনে সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর বেরার মোগল-সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়।

পরবর্ত্তী বৎসর পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খান্দেসের রাজা পরাজিত হইয়া আকবরের সৈন্য-দলে প্রবেশ করিলেন। আকবর স্বয়ং দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এদিকে সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ দানিয়াল অহমদনগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। যখন আকবর ইহার সহিত সম্মিলিত হন, তখন অহমদনগরের সেনারা এত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে, এবং যুদ্ধ করিতে এত অনিচ্ছু হয়, যে, তাহারা চাঁদ সুলতানার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক উক্ত রাজ্য আকবরের হস্তে সমর্পণ করে (১৬০০)।

**সলিমের বিদ্রোহ।**—আকবর যখন দক্ষিণাপথের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সলিম অযোধ্যা ও বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। ইহাতে আকবর শীঘ্রই দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিয়া

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা সমর্পণ করেন। কিন্তু শেষে সলিমের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা দর্শনে আকবর এত বিরক্ত হইয়াউঠেন যে, তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। সলিম ইহাতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আগ্রায় আইসেন।

**আকবরের মৃত্যু, ১৬০৫।**—যুবরাজ মোরাদ ও দানিয়ালের মৃত্যুতে এবং সলিমের অব্যবস্থিততায় আকবর এরূপ ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িলেন যে, অবিলম্বে নিদারুণ রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আকবর এই আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

**আকবরের চরিত্র।**—আকবর অতি সুপুরুষ, বিনয়ী, সদালাপী ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তিনি আহার পানে অত্যন্ত আমোদ করিতেন বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে সে আমোদ কিছুই ছিল না। তিনি অতি মিতাচারী ছিলেন। বৎসরের মধ্যে তিনমাস আমিষ ভোজন করিতেন না। তিনি এমন সুনিয়মে কার্য্য করিতেন যে, যুদ্ধাদিতে ব্যস্ত থাকিয়াও পুস্তক-পাঠ, ধর্ম্মালোচনা ও মৃগয়ার্থ অনেক অবকাশ পাইতেন। শাস্ত্রালাপে আকবরের যেরূপ আমোদ ছিল, মৃগয়াতেও সেইরূপ আমোদ ছিল। বিশেষতঃ ব্যাঘ্র বধ করিতে ও বন্য হস্তী ধরিতে তিনি অধিকতর আগ্রহান্বিত হইতেন।

**ধর্ম্ম।**—ধর্ম্ম বিষয়ে আকবরের উদার ভাব ছিল। তিনি যৌবনাবস্থায় অনেক তীর্থ দর্শন ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর, তখন

মক্কা গমনেও বড় ইচ্ছা ছিল। আকবর কাহাকেও বলপূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেন না। আকবরের ধর্ম্মভাব ক্রমে উন্নত হয়। ফাইয়াজী ও আবুয়লফজল নামক দুই সহোদর আকবরের সভায় থাকিতেন। ফাইযাজী সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পরিশেষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুবাদ করেন। প্রতি শুক্রবার আকবরের সভায় ধর্ম্মবিষয়ে অনেক তর্ক হইত। আকবর হিন্দু, মুসলমান, পারশীক, ইহুদী প্রভৃতি অনেক জাতির যুক্তি মনোযোগের সহিত শুনিতেন। এই তর্কে এক এক বার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। আকবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে জগজ্জীবন, জগৎ-প্রভাকর সূর্য্যের আরাধনা করিতেন।

আকবরের মন্ত্রী।—আকবরের সভা অন্যান্য পণ্ডিত-বর্গেও অলঙ্কৃত ছিল। বিখ্যাত তোড়রমল রাজস্বে বিচক্ষণ ছিলেন, এবং বিখ্যাত মিঞা তানসেন সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। আবুয়লফজল আইন-আকবরীর রচনাকর্ত্তা। উহাতে আকবরের রাজত্ব-সময়ের সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৬০৩ অব্দে যুবরাজ সলিমের ষড়যন্ত্রে আবুয়লফজল নিহত হন। বিচক্ষণ মন্ত্রীর এইরূপ গুপ্তহত্যায় আকবর বৃদ্ধবয়সে যার-পর-নাই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। হত্যাকারীর সমুচিত দণ্ডবিধান না করা আকবরের শেষ অবস্থার একটি দুরপনেয় কলঙ্ক।

সংস্কার।—আকবর অনেক সামাজিক ও রাজকীয় প্রথার সংস্কার করেন। পূর্ব্বে হিন্দুদিগকে "জিজিয়া" নামে এক প্রকার কর দিতে হইত। আকবরের আদেশে তাহা রহিত হয়। এতদ্ব্যতীত আকবর হিন্দুদের বাল্য-বিবাহ-প্রথা

নিবারণ করেন, তাঁহার যত্নে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তিনি সতীদাহ নিবারণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি গুরুতর দৈহিক শাস্তি উঠাইয়া দেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমান, উভয়কেই সমভাবে দেখিতেন, উভয়ের উন্নতি বিধান করিতে তাঁহার চেষ্টা ও ইচ্ছা ছিল। উপযুক্ত হইলে তিনি উভয়কেই সমান ভাবে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার সময় হিন্দুগণ প্রধান রাজস্ব-সচিব ছিলেন, প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এবং রাজকীয় বিষয়ের প্রধান মন্ত্রণা-দাতা ছিলেন।

রাজস্বের বন্দোবস্ত।—আকবরের করগ্রহণের প্রথা অতি উত্তম ছিল। আকবর শের শাহের নিয়ম সংশোধন পূর্ব্বক জরিপ জমাবন্দী ও কর গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ভূমির মাপের নানা প্রকার যন্ত্র ছিল, আকবর সে সকল রহিত করিয়া এক প্রকার হাতকাঠী প্রচলিত করেন। এই হাতকাঠীতে রাজ্যের যাবতীয় ভূমির মাপ হইত। উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে ভূমি, উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। তিন প্রকার ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইত, আকবর তাহার গড় পড়তা করিয়া কর স্বরূপ তিন ভাগের এক ভাগ* আপনি গ্রহণ করিতেন, অপর দুই ভাগ প্রজাকে দিতেন।

* যথা—এক খণ্ড ভূমিতে গম জন্মে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| উত্তম ভূমি হইতে উৎপন্ন প্রতি বিঘাতে | | | | ১৮ মণ। |
| মধ্যম ভূমি | ,, | ,, | ,, | ১২ মণ। |
| অধম ভূমি | ,, | ,, | ,, | ৮৸৫ মণ। |
| সমষ্টি | ... | ... | ... | ৩৮৸৫ উৎপন্ন হয়। |

যে ভূমিতে সকল সময় শস্য জন্মিত, কখন পতিত রাখিতে হইত না, তাহার রাজস্বের ন্যূনাতিরেক হইত না। যে ভূমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিতে হইত, তাহার শস্য উৎপন্ন হইলে রাজস্ব দিতে হইত, নতুবা রাজস্ব দিতে হইত না। যে ভূমি বন্যায় ডুবিয়া যাইত, অথবা তিন বৎসর পতিত থাকিত, কিংবা আবাদে ব্যয়-বাহুল্য হইত, তাহার রসদজমা নির্দ্দিষ্ট হইত, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে পঞ্চাংশের এক অংশ, দ্বিতীয় বৎসরে পঞ্চাংশের দুই অংশ, এই প্রকার পাঁচ বৎসরে পূরা জমা দেওয়া স্থির হইত। যে ভূমি পাঁচ বৎসরের অধিক কাল পতিত থাকিত, তাহার রসদ আরও কম হইত। আমলাখরচা ও আর কোন বাব আবওয়াব ছিল না। প্রজারা কেবল রাজার প্রাপ্য অংশ দিত। যে স্থলে শস্যের পরিবর্ত্তে টাকা লওয়া হইত, সে স্থলে গত উনিশ বৎসরের মূল্য গড় করিয়া যে পড়তা হইত, সেই হারে মালগুজারি করিতে হইত।

সাম্রাজ্যের বন্দোবস্ত।—আকবর কেবল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি অধিকৃত রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করেন। সমগ্র সম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত হয় *। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন

| | |
|---|---|
| উহার গড় ... ... ... | ১২৬৮৷৹ সের। |
| রাজার প্রাপ্য ... ... ... | ৪৷২৬/৹। |

শের সাহ উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বাব আবওয়াব ছিল, তাহাতে রাজস্ব প্রায় এক-তৃতীয়াংশের তুল্য হইত।

* ১৫ সুবাঃ—১ এলাহাবাদ, ২ আগ্রা, ৩ অযোধ্যা, ৪ আজমীঢ়, ৫ গুজ-

সুবাদার থাকিতেন। সুবাদারগণের হস্তে রাজস্ব, বিচার ও সৈন্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার ছিল। তাঁহারা যথানিয়মে আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, শান্তি রক্ষার জন্য নগর-সমূহে এক এক জন কোতয়াল থাকিতেন।

বিচার।—বিচার-কার্য্য প্রধান বিচারপতি ( মির-আদেল ) ও কাজী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। শেষোক্ত ব্যক্তি অভিযোগ শুনিয়া ব্যবস্থা দিতেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যথানিয়মে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতেন।

সৈন্য।—পূর্ব্বে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে জাইগীর দেওয়া হইত। সৈন্যাধ্যক্ষগণ ঐ জাইগীরের উপস্বত্ব হইতে আপন আপন সৈন্যদিগকে বেতন দিতেন। কিন্তু এই নিয়ম দৌরাত্ম্য-জনক হওয়াতে আকবর তাহা রহিত করেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ মন্‌সবদার উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহারা আপনাদের অধীনস্থ দশ হাজার, সাত হাজার, পাঁচ হাজার, কি তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্যের বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন। ইঁহাদিগকে এইরূপে দশ হাজারী, সাত হাজারী প্রভৃতি বলা যাইত।

## জাহাঁগীর, ১৬০৫-১৬২৭।

যুবরাজ সলিম "জাহাঁগীর" অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম আবুয়ল মোজাফ্‌ফর নুরদ্দীন জাহাঁগীর বাদশাহ।

জাহাঁগীরের রাজত্বের প্রারম্ভে হিন্দুস্তানে কোন গোলযোগ

রাট, ৬ বিহার, ৭ বাঙ্গালা, ৮ দিল্লী, ৯ কাবুল, ১০ লাহোর, ১১ মুলতান, ১২ মালব, ১৩ বেরা., ১৪ খান্দেশ, ১৫ অহমদনগর।

ছিল না। কিন্তু দক্ষিণাপথে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন উদয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। জাহাঁগীর পিতার সমস্ত কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব পদে স্থাপিত করিয়া এবং সাধারণের সমক্ষে আপনাকে স্বধর্ম্ম-নিরত ভক্তিমান্ মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিয়া, রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

**যুবরাজ খস্‌রুর বিদ্রোহ ও পরাজয়।**—সম্রাটের পুত্র খস্রু পিতার আগ্রায় অবস্থিতি-কালে দিল্লী হইতে লাহোরে যাইয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু শেষে তাঁহার পরাজয় হয়। জাহাঁগীর খস্রুর সাত শত অনুচরকে তাঁহার সমক্ষে শূলে আরোহিত করেন, এবং খস্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাবুলে রাখেন।

**মালেক আম্বর।**—১৬১০ খ্রীঃ অব্দে জাহাঁগীর দুই দল সৈন্যের এক দলকে দক্ষিণাপথে মালেক আম্বরের বিরুদ্ধে, অপর দলকে উদয়পুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মালেক আম্বর অহমদনগরের রাজমন্ত্রী। আকবর আহমদনগর অধিকার করিয়া, তথায় যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, মালেক আম্বর তাহা পরাজিত করিয়া ঐ স্থান অধিকার করেন। যুবরাজ পরবেজ্ এক্ষণে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এ দিকে গুজরাট হইতে আবদুল্লা খাঁর অধীনে আর এক দল সৈন্য আসিতে লাগিল। মালেক আম্বর সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কৌশল পূর্ব্বক ঐ সকল সৈন্যের আহার-সামগ্রী আনিবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে মোগল সৈন্যের যার-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। দক্ষিণ রাজ্য মালেক আম্বরের হস্তেই রহিল।

**নুরজাহান।**—নুরজাহানের ইতিহাস বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। গেয়াস্‌বেগ এতমাদ্‌ উদ্দৌলা নামক তেহরাণের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এজন্য তিনি অর্থোপার্জ্জন মানসে সস্ত্রীক ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। এই সময় গেয়াস্‌বেগের বনিতা পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন। পথে তাঁহাদের যার-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা বৃক্ষের ফলমূল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে গেয়াস্‌বেগের স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। সদ্যোজাতা কন্যার জীবনরক্ষার কোন উপায় করিতে না পারিয়া, গেয়াস বিষণ্ণচিত্তে তাহাকে একটি বৃক্ষের নীচে পত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া আসিলেন। এই রূপে দুহিতা-রত্নকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কিছু দূর গেলে গেয়াসের স্ত্রী তনয়ার জন্য সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। এজন্য গেয়াস্‌ পুত্রীকে আনিবার জন্য বৃক্ষের নিকটে যাইয়া দেখেন, একটি ভীষণ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শিশুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। গেয়াসবেগ এই ব্যাপার দর্শনে শশব্যস্তে সর্পকে তাড়াইয়া কন্যাটি আনয়ন পূর্ব্বক স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে এক দল বণিক তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা গেয়াস্‌ ও তাঁহার স্ত্রীর দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া আহার-সামগ্রী দিল। গেয়াসবেগ স্ত্রী ও কন্যা লইয়া তাহাদের সহিত ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া গেয়াসবেগ আকবরের দরবারে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহার গুণ-গৌরব প্রকাশ পাইতে লাগিল। আকবর গুণীর অমর্য্যাদা করিতেন না। তিনি

ক্রমে গেয়াসকে উন্নত পদে স্থাপন করিলেন। অদৃষ্টের কথা কিছুই বলা যায় না। অরণ্য-মধ্যে যে গেয়াসের প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই গেয়াস এক্ষণে দিল্লীর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন।

গেয়াসবেগ কন্যার নাম মেহেরুন্নেসা রাখিয়াছিলেন। ক্রমে কন্যা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ও সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিল। গেয়াসবেগ শের আফগান নামক এক জন সম্রান্ত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

জাহাঁগীর পিতার জীবদ্দশায় একদা মেহেরুন্নেসার রূপ-লাবণ্য দর্শনে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ সময় শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নেসার সম্বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং আকবর বাগ্‌দত্তা কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। জাহাঁগীর পিতার ভয়ে সে সময় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এক্ষণে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া, তিনি চিরাভীষ্ট স্ত্রীরত্ন লাভে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শের আফগানকে বধ করিবার জন্য নানা উপায়ের কল্পনা হইতে লাগিল। শের অতিশয় সাহসী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম আস্তাজিলো, সহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে বধ করাতে তিনি "শের" নাম গ্রহণ করেন। শের জাহাঁগীরের কুচক্রে প্রথমে নিরস্ত্র হইয়া একটি ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাঘ্র শেরের আক্রমণে পরাজিত ও গতাসু হয়। প্রথম উপায় নিষ্ফল হওয়াতে জাহাঁগীর একটি মত্ত হস্তীকে কৌশলক্রমে শেরের উপর চাপাইয়া দেন। কিন্তু শের অসির আঘাতে হস্তীর শুণ্ডচ্ছেদ করাতে

হস্তী প্রাণভয়ে পলায়ন করে। শের জাহাঁগীরের এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাজমহলে আসিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার কোতোবদ্দিন সম্রাটের অভিসন্ধিক্রমে তাঁহাকে বধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কোতোব প্রথমে কতকগুলি সশস্ত্র দস্যুকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহারা রাত্রিকালে শেরের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলে শের অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। ইহার পর শের রাজমহল হইতে বর্দ্ধমানে আইসেন। এদিকে কোতোবও রাজ-কার্য্য পরিদর্শনের ছলে তথায় উপনীত হন। কোতোব বর্দ্ধমানে আসিলে শের তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করেন। এই সময় এক ব্যক্তি পথ ছাড় বলিয়া শেরকে আঘাত করে। শের তখন সমুদয় বুঝিতে পারিয়া তরবারির এক আঘাতেই কোতোবের শিরশ্ছেদ করিলেন। ইহাতে কোতবের সৈন্যগণ শেরকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। শের অনেককে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শেষে শত্রু-সংখ্যা অধিক দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত হইলেন, এবং পুণ্যভূমি মক্কাভিমুখ হইয়া জলের অভাবে ধূলি-মুষ্টি মস্তকে স্থাপন করিলেন। একে একে চারিটি গুলি তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অন্যায় সমরে পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বর্দ্ধমানে আকবরের সময়ে বহরাম নামক এক জন মুসলমান কবির সম্মানার্থ একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সচরাচর উহাকে বহরাম মসজিদ বলে। শেরের দেহও ঐস্থানে সমাহিত হয়। বর্দ্ধমানে আজপর্য্যন্ত এই স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শেরের মৃত্যুর পর মেহেরুন্নেসা দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে স্বামীহন্তা জাহাঁগীরের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। ইহার চারি বৎসর পরে রাজমহিষী হইবার লোভ প্রবল হওয়াতে তিনি জাহাঁগীরকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। জাহাঁগীর তাঁহাকে "নুরজাহান" অর্থাৎ জগজ্জ্যোতিঃ নাম দিয়া ১৬১১ অব্দে বিবাহ করিলেন।

এই অবধি রাজ্যমধ্যে নুরজাহানের অসীম প্রভুত্ব হইল। তিনি জাহাঁগীরের অনুচিত পানদোষ নিবারণ করিলেন, তাঁহাকে সকলের সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতে প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং রাজ্যে অনেক সুনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেন। জাহাঁগীর আবাস-গৃহের নিকটে একটি দোদুল্যমান ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, যে কেহ ঐ ঘণ্টা বাজাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

নুরজাহান বাই-আনা পোশাক ও গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। তখন ৮০ টাকায় আতরের ভরী বিক্রীত হইত। নুরজাহান বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। এই সকল গুণে জাহাঁগীর তাঁহার একান্ত বশীভূত হন। নুরজাহানের নাম তৎকাল-প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যে খোদিত হয়:—"জাহাঁগীরের আদেশে মহারাজ্ঞী নুরজাহানের নাম-প্রভাবে সুবর্ণ শতালঙ্কারে বিভূষিত হইল।"

**উদয়পুর ও মাড়বার অধিকার।**—ইহার পর জাহাঁগীরের অন্যতম পুত্র যুবরাজ খোরম উদয়পুর ও মাড়বার রাজ্য জয় করেন। এই কৃতকার্য্যতায় খোরমের অতিশয়

সুখ্যাতি হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে "শাহজহাঁ" অর্থাৎ "পৃথ্বীরাজ" উপাধি দিলেন, এবং গুজরাটের সুবাদারী দিয়া তাঁহাকে দক্ষিণাপথে মালেক আম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। খোরম অতঃপর শাহজহাঁ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। খসরু কারারুদ্ধ থাকাতে এবং যুবরাজ পরবেজ অনুপযুক্ত হওয়াতে জাহাঁগীর শাহজহাঁকেই রাজ্য দিবার সঙ্কল্প করেন। এদিকে অনতিবিলম্বেই খসরুর মৃত্যু হয় (১৬২১)।

স্যার তমাস রো।—ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেম্সের দূত স্যার্ তমাস রো জাহাঁগীরের দরবারে উপস্থিত হন (১৬১৫)। কথিত আছে, তিনি সম্রাট্‌বংশীয় দুই ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

শাহজহাঁ।—নূরজাহানের একটি কন্যা ছিল। সম্রাটের চতুর্থ পুত্র সহরএয়ারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এজন্য নূরজাহান সহরএয়ারের পক্ষে ছিলেন। এক্ষণে শাহজহাঁর প্রবল ক্ষমতা দেখিয়া নূরজাহানের মনোমালিন্য জন্মিল। জাহাঁগীর শাহজহাঁকে ইহার পর দক্ষিণাপথে যাইতে আদেশ করিলেন। শাহজহাঁ ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মহব্বত খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহজহাঁ মালেক আম্বরের সহিত মিলিত হন, কিন্তু পরিশেষে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

মহব্বত খাঁ।—ইহার অব্যবহিত পরেই সেনাপতি মহব্বত খাঁর সহিত নূরজাহানের বিবাদ উপস্থিত হয়। মহব্বত সাতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নূরজাহান তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে

জাহাঁগীর কাবুলে যাইবার নিমিত্ত সিন্ধু নদের তটে তাম্বু ফেলিয়াছিলেন। নুরজাহান বাঙ্গালার হিসাব দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্রাটের নিকটে আহ্বান করিলেন। মহব্বত ইহাতে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ৫,০০০ বিশ্বাসী রাজপুত সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। জাহাঁগীরের সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় মহব্বত উত্তরণসেতু অবরোধ পূর্ব্বক সম্রাটকে আটক করিলেন। নুরজাহান ইহাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া সম্রাটের সহিত মহব্বতের বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

**জাহাঁগীরের মুক্তিলাভ, ১৬২৭।**—পরে নুরজাহানের পরামর্শে জাহাঁগীর মহব্বতের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন। একদা জাহাঁগীর সৈন্য-পরিদর্শন-ছলে মহব্বতকে শিবিরে রাখিয়া আপনার সৈন্যশ্রেণীর নিকট উপস্থিত হন। এই অবসরে সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া মহব্বতের হস্ত হইতে বিমুক্ত করে। জাহাঁগীর বিমুক্ত হইয়া মহব্বতকে ক্ষমা করেন, এবং তাঁহাকে শাহজহাঁর বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন।

**জাহাঁগীরের মৃত্যু, ১৬২৭।**—এই বৎসরেই লাহোরে জাহাঁগীরের মৃত্যু হয়। জাহাঁগীর যদিও মদ্যপায়ী ছিলেন, তথাপি আপনার রাজ্যে মদ্যপান একবারে নিষেধ করেন এবং অহিফেন সেবনের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। রাজকীয় লোকেরা বণিকদিগের বাণিজ্য-দ্রব্যাদি খুলিয়া দেখিত, রাজ-সৈন্য ও রাজকিঙ্করেরা বলপূর্ব্বক অপরের বাটীতে যাইয়া বাসা করিত। জাহাঁগীর এই সকল দৌরাত্ম্য একবারে নিবারণ করেন। এতদ্ব্যতীত নাসা কর্ণ ছেদন পূর্ব্বক দণ্ড-বিধা-

নের যে কুরীতি ছিল, তদীয় রাজত্বকালে তাহাও রহিত হয়। জাহাঁগীরের সময় এতদ্দেশে তামাক আইসে। জাহাঁগীর ইহার ব্যবহার রহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই তামাক সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

## শাহজহাঁ, ১৬২৭-১৬৫৮।

জাহাঁগীরের মৃত্যুর পর শাহজহাঁ মহাসমারোহে দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। কথিত আছে, এই উৎসব উপলক্ষে ১৬,০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই রাজত্বে নুরজাহানের ভ্রাতা—রাজমন্ত্রী আসফ খাঁ ও সেনাপতি মহব্বত খাঁ বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন, নুরজাহান অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হন। জাহাঁগীরের মৃত্যুর পর নুরজাহান ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজকার্য্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। শাহজহাঁ তাঁহাব ভরণ-পোষণ জন্য বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি জাহাঁ-গীরের মৃত্যুর পর অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন, মাংসাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজনে তৃপ্ত হইতেন। তাঁহার অনুমতি ক্রমে মৃত্যুর পর তদীয় শব জাহাঁগীরের শবের পার্শ্বে সমাহিত হয়।

**খাঁ জাহান লোদী।**—যুবরাজ পরবেজের এক জন সেনাপতি খাঁ জাহান লোদী বিদ্রোহী হইয়া, মালেক আম্বরের পুত্রের সহিত মিলিত হন। ইহাতে দক্ষিণাপথে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, খাঁ জাহান অবশেষে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া অহমদনগরে প্রবেশ করেন। এই স্থানে তিনি

১৬২৯ অব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। এই বৎসর সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। খাঁ জাহান অহমদনগর হইতে বিজয়পুরে যাইয়া আদেল শাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু খাঁ জাহানের পশ্চাতে বহুসংখ্য সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া, বিজয়পুর-রাজ আশ্রয় দিতে অসম্মত হন। খাঁ জাহান ইহাতে মালব হইতে বুন্দেলখণ্ডে গমন করেন। এই স্থানে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর বৎসর অহমদনগর শাহজহাঁর হস্তগত হয়।

বিজয়পুরে যাত্রা।—অনন্তর সম্রাট বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। আসফ খাঁ উপস্থিত থাকিয়া নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়পুরের সৈন্যগণ এমন সাহস ও পরাক্রমের সহিত আত্মরক্ষা করেন যে, মোগলেরা উক্ত নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। শাহজহাঁ মহব্বত খাঁকে দক্ষিণাপথে রাখিয়া স্বয়ং দিল্লীতে উপস্থিত হন। এ সেনাপতিও বিজয়পুর অধিকার করিতে অসমর্থ হন। এজন্য সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীতে আসিতে লিখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ-স্থলে গমন করেন। কিন্তু তিনিও মহব্বতের ন্যায় অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে বিজয়পুর-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ছয় বৎসর কাল মহাপরাক্রান্ত আদেল শাহ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর কাল ব্যাপিয়া তিনি মোগলদিগের সমুদয় চেষ্টা ও সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বল্খ্-জয়, ১৬৪৬।—শাহজহাঁ কাবুলে যাত্রা করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দানও যুবরাজ মোরাদকে বল্খ্

জয় করিতে প্রেরণ করেন। ইহাদের উদ্‌যোগ সর্ব্বাংশে অফল হয়। যুবরাজ আওরঙ্গজেবের হস্তে বল্‌খের শাসন-ভার সমর্পিত হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ইউজবকেরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ঐ স্থান অধিকার করে।

**পারশীক কর্ত্তৃক কান্দাহার অধিকার, ১৬৫৩।**—ইহার পর পারশীকেরা শাহ আব্বাসের অধীনে আসিয়া কান্দাহার অধিকার করে। আওরঙ্গজেব ও দারাসেকো এই স্থান পুনরধিকার করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কান্দাহারে পারস্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

পরবর্ত্তী দুই বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত হয়। ইহার শেষে গোলকুণ্ডার মন্ত্রী মিরজুম্লা স্বীয় প্রভু আবদুল্লা খাঁর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া শাহজহাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে আওরঙ্গজেব তথায় প্রেরিত হন। আবদুল্লা প্রতি-বৎসর এক কোটী টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

**সিংহাসন লইয়া বিবাদ।**—শাহজহাঁর চারি পুত্র,—দারাসেকো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ। দারার হস্তে রাজ-প্রতিনিধিত্ব ছিল, ইনি সাহসী, বিনয়ী ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। সুজা বাঙ্গালার সুবাদারী করিতেন, ইঁহার চরিত্র অব্যবস্থিততা, অবিনয় ও নিষ্ঠুরতায় দূষিত ছিল। আওরঙ্গজেব কপট কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মোরাদ সাহসী ও সদাশয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ প্রতিভা ছিল না।

শাহজহাঁ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলে সিংহাসন লইয়া এই ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। সম্রাটের পীড়ার সময় দারার হস্তে রাজ্য-শাসনের ভার ছিল। ইহাতে দ্বিতীয় ভ্রাতা সুজা বিদ্রোহী হইয়া বিহারে আসিলেন, অপর দিকে মোরাদ স্বাধীন হইয়া সুরত আক্রমণ করিলেন। আওরঙ্গজেব স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে এই সময় অতিশয় সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বপ্রধান না হইয়া মোরাদের সহিত মিশিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দারা ও সুজা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবসন্ন হইলে তিনি পাকে প্রকারে মোরাদকে হস্তগত করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। এজন্য তিনি মোরাদকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট করিলেন যে, রাজ্য অধিকার করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন দেওয়াইয়া স্বয়ং ফকীর হইবেন। এ দিকে দারা, সুজাকে পরাজিত করিয়া আওরঙ্গজেব ও মোরাদের সম্মিলিত সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে দারার পরাজয় হয়। পরবৎসর দারা আবার যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী শ্যামগড়ে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মোরাদ বিলক্ষণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত হস্তী উত্তেজিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলে তিনি উহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গতিরোধ করিয়াছিলেন। এবারেও দারা পরাজিত হইয়া আগ্রায় পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া পিতাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। ইহার পর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক মোরাদকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হন (১৬৫৮)। এইরূপে শাহজহাঁর রাজত্ব শেষ হয়।

**শাহজহাঁর চরিত্র।**—যৌবনাবস্থায় শাহজহাঁর চরিত্র তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু রাজদণ্ড গ্রহণ করা অবধি তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ দেখা যায় নাই। তিনি প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, প্রজাদের দুঃখের কথা শুনিলে সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও অগ্রে তাহার প্রতীকার করিতেন। এরূপ প্রজাবৎসল নৃপতি প্রায় দেখা যায় না।

**শাহজহাঁর রাজস্ব।**—শাহজহাঁর রাজত্ব-সময়ে মোগল সাম্রাজ্য অধিকতর বলসম্পন্ন হয়। আকবরের সময়ে ভূমির রাজস্ব ১৭৷৷০ কোটী টাকা ছিল। শাহজহাঁর সময়ে উহা ২২ কোটী হয়।

**শাহজহাঁর অট্টালিকা ও শিল্প-দ্রব্য।**—রাজ্যের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন ও শিল্পের উৎকর্ষ-বিধানে শাহজহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে তাজমহল নির্ম্মিত হয়। শাহজহাঁর মমতাজমহল নামে এক মহিষী ছিলেন। শাহজহাঁ ইহার সমাধির উপর এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। মমতাজমহলের নামানুসারে এই সমাধি-মন্দিরের নাম "মমতাজ-মহল" হয়। ক্রমে মমতাজমহল 'তাজমহল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অট্টালিকার জন্য আরব, বাগ্‌দাদ, সিংহল, মিশর, কোমায়ুন প্রভৃতি দেশ হইতে বহুমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইয়াছিল। তাজমহল নির্ম্মাণে সর্ব্বসমেত ৪,১৪,১৮,৮২৬ টাকা ব্যয় হয়। প্রত্যহ ২২ হাজার লোক উহার কায করিত। কথিত আছে, উহা নির্ম্মাণ করিতে ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। পৃথিবীতে তাজমহলের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদ দুর্লভ। শাহজহাঁ আগ্রার দুর্গে "মতিমসজিদ" নামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। পৃথিবীতে মতিমসজিদের ন্যায় সুদৃশ্য ও শোভা-

জনক উপাসনা-গৃহ বোধহয় আর নাই। শাহজহাঁর রাজত্বে দিল্লী-নগরী "জুম্মামস্‌জিদ" নামে একটি সুন্দর অট্টালিকায় শোভিত হয়। উহা তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে আরম্ভ হইয়া, দশম বর্ষে শেষ হয়। "দেওয়ানিখাস" ও "দেওয়ানিআম" নামক দরবার গৃহ অতিসুন্দর ও সুদৃশ্য। এই সকল অট্টালিকা ব্যতীত শাহজহাঁর আদেশে "ময়ূর-সিংহাসন" নির্ম্মিত হয়। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া রাখিলে যেমন দেখায়, "ময়ূর-সিংহাসন" সেইরূপ গঠনের হইয়াছিল, ময়ূরের পুচ্ছে যেখানে যে প্রকার বর্ণ, সিংহাসনও সেই থানে সেই বর্ণের রত্ন দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এক জন রত্ন-পরীক্ষক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সিংহাসন যে সকল রত্ন ও মণিদ্বারা খচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মূল্য অন্যূন ৭ কোটী টাকা হইবে। নাদের শাহ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত সিংহাসন হস্তগত করেন।

## আওরঙ্গ্‌জেব, ১৬৫৮-১৭০৭।

আওরঙ্গজেব "আলম্‌গীর" অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম মহম্মদ মহিউদ্দীন আলম্‌গীর বাদশাহ। কিন্তু সচরাচর ইনি আওরঙ্গ-জেব নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

**দারার পরাজয় ও মৃত্যু, ১৬৫৯।**—দারা পলায়ন করিয়া লাহোরে উপস্থিত হন। সে স্থানে তাঁহার পুত্র সোলেমান পিতার সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ধৃত হইয়া, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের দুর্গে অবরুদ্ধ হন। দারা ইহার পর আজমীঢ়ে যাইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার পরাজয় হয়। ইহাতে দারা যথাক্রমে আহমদাবাদ, কচ ও কান্দাহার হইতে সিন্ধুদেশের অন্তঃপাতী

জুন নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানের অধিবাসীরা বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করেন।

**সুজার পলায়ন ও মৃত্যু, ১৬৬০।**—সম্রাটের পুত্র মহম্মদ সুলতান এবং সেনাপতি (গোলকুণ্ডার পূর্ব্বতন মন্ত্রী) মিরজুম্লা সুজার বিরুদ্ধে যাওয়াতে সুজা আরাকানে পলায়ন করেন। ঐ স্থানে সপরিবারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

**সোলেমান ও মোরাদের মৃত্যু।** দারার পুত্র সোলেমান শ্রীনগর হইতে আগ্রায় আনীত হন। এই স্থানে তাঁহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হয়। মোরাদ গোবালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন; সম্রাট তাঁহাকেও হত্যা করেন (১৬৬১)

**মিরজুম্লার আসামে যাত্রা ১৬৬২।**—সেনাপতি মিরজুম্লা আসাম জয় করিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে বিফল হয়। আসামবাসীরা নানাদিক হইতে আসিয়া মোগল সৈন্যের গতিরোধ করে এবং তাহাদের খাদ্য সামগ্রী আনয়নের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। এদিকের বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত সমুদয় সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিরজুম্লা অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন, কিন্তু পথকষ্টে ও আপনার দুরবস্থার জন্য অন্তর্ব্বেদনায় ঢাকায় পহুঁছিবার পুর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া, রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক করেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহার উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। এই সময় যোধপুরের রাজা পরাক্রান্ত যশোবন্ত সিংহ এবং মহব্বত খাঁর পুত্র পরামর্শ করিয়া শাহজহাঁকে কারাগার হইতে বিমুক্ত

করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আওরঙ্গজেবের আরোগ্যলাভ হয়। এ ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজেব রোগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া আর এক পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তে পতিত হন। এক্ষণে ইহার বিবরণ লিখিত হইতেছে।

মরহাট্টাদিগের অভ্যুদয়।—অনেকে কহেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা সূর্য্যবংশীয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ শত্রুর আক্রমণে ভীত হইয়া মহারাষ্ট্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যাহা হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মরহাট্টাদিগের নাম সাধারণ্যে পরিজ্ঞাত ছিল না। বিজয়পুরের রাজসরকার হইতেই ইহাদের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। মালেক আম্বরের সময় ইহারা অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। মালেক আম্বরের যদুরাও নামক একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মালজী ভোঁসলা নামক এক ব্যক্তি যদুরাওর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। মালজীর শাহজী নামে একটি পুত্র ছিল। ইহার সহিত যদুরাওর কন্যা জিজির বিবাহ হয়। এই দম্পতি হইতে শিবজী জন্ম গ্রহণ করেন (১৬২৭)। এই শিবজী মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সংস্থাপক। শিবজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শম্ভুজী।

শিবজী, ১৬২৭-১৬৮০।—শাহজী বিজয়পুরের রাজসরকারে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া মহীশূরে জায়গীর পাইয়াছিলেন। তিনি শম্ভুজীকে মহীশূরে আপনার নিকট রাখিতেন। শিবজী পূনাতে থাকিতেন, দাদাজী কর্ণদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ শিবজীর রক্ষক ছিলেন। শিবজী অতিশয় সাহসী ও চতুর ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে যার-পর-নাই ঘৃণা করিতেন, সর্ব্বদা বয়স্যদিগের সমক্ষে কহিতেন, 'আমি

মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" শিবজীর এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই।

দাদাজী তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া সর্ব্বদাই পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতেন। ইহাতে তাঁহার সাহস ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, এবং পার্ব্বত্য পথ সমূহ সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইল। তিনি সর্ব্বদা লুঠ ও বিবাদ লইয়াই কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন

দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবজী পূনার জাইগীরের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া চারিদিক লুঠ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শিবজী বিজপুর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বিজয়পুর-রাজ এজন্য শিবজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধিতে শিবজীর কঙ্কণ প্রদেশ লাভ হয়। এই সময়ে শিবজীর পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও সাত হাজার অশ্বারোহী সেনা হইয়াছিল।

মোগল সম্রাটের অধিকৃত প্রদেশও শিবজীর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকে নাই। শিবজী মোগল-রাজ্যের অনেক স্থান লুঠ করেন (১৬৬২)। এজন্য দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। শায়েস্তা খাঁ আসিয়া পূনা অধিকার ও অবরোধ করিয়া শিবজীর ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে শিবজী ২৫ জন সাহসী সেনার সহিত বরযাত্রীর দলে মিশিয়া শায়েস্তা খাঁর বাস-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণে প্রাণে আওরঙ্গাবাদে পালাইলেন, এদিকে শিবজী সুরত লুঠিয়া লইলেন (১৬৬২)।

**শিবজীর "রাজা" উপাধি গ্রহণ, ১৬৬৪।—** শাহজীর মৃত্যু হইলে শিবজী পিতৃ-সম্পত্তি বলিয়া তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ অধিকার করেন। এতদ্ব্যতীত কঙ্কণ তাঁহার অধীনে থাকে। ইহার পর শিবজী প্রকাশ্যভাবে "মহারাষ্ট্রের অধিপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়া নানাদিক লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন।

**চৌথ।—**এজন্য আওরঙ্গজেব যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া দুই দল পরাক্রান্ত সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন (১৬৬৫)। রাজা জয়সিংহ এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। শিবজীর সৈন্যসংখ্যা অল্প ও যুদ্ধোপকরণ সামান্য ছিল। হঠাৎ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য শিবজী আপনার সৈন্যদিগকে দূরে রাখিলেন, এবং একাকী মোগল সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি-পত্রে এই লিখিত হইল যে, শিবজী স্বাধিকৃত ৩২টি দুর্গের মধ্যে ১২টি রাখিয়া ২০টি ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় ভূমি পরিত্যাগ করিবেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি দক্ষিণাপথের মোগল রাজ্যে উৎপন্ন রাজস্বের একচতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহাই চৌথ নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্ত্তী বৎসর শিবজী আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দিল্লীতে যাত্রা করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের সভাগৃহে সমাগত হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহার যথোচিত সমাদর না করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের আসনে বসাইয়া দেন। শিবজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সভা-গৃহ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ তাঁহার বাস-গৃহে প্রহরী রাখিতে

নগরের কোতোয়ালকে বলিয়াদিলেন। এদিকে চতুর মহারাষ্ট্রপতি, দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট অনুমতি চাহিলেন। সমভিব্যাহারী লোক চলিয়া গেলে শিবজী সহায়-বিহীন, সুতরাং তাঁহার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে এই কথা ঘোষণা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়িতে ফকীর ও সন্ন্যাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার আবাস-গৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়িতে কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময় শিবজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে চড়াইয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবজী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগে শম্ভুজীকে রাখিয়া তৎপর দিন মথুরায় উপনীত হইলেন। এই খানে কতিপয় বন্ধুর নিকট শম্ভুজীকে রাখিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আসিলেন (১৬৬৬)। ইহার পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভুজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন।

**শাহজহাঁর মৃত্যু, ১৬৬৬।**—এই বৎসর কারাগারে হতভাগ্য সম্রাট্ শাহজহাঁর মৃত্যু হয়।

**শিবজীর "রাজা" "উপাধির দৃঢ়তা, ১৬৬৭।**— এই সময় বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে শিবজী

বিজয়পুর-রাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে একটি জাইগীর দিয়া "রাজা" উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর শিবজী সম্রাটের অনুরোধে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন।

শিবজীর রাজ্যের শৃঙ্খলা, ১৬৬৯।—যুদ্ধের বিরাম হইলে শিবজী স্বীয় রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। তিনি রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষকদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত। শিবজী আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈন্যদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই মাউলীজাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা মাসে ৩।৪ টাকা হইতে ১০।১২ টাকা বেতন পাইত, অশ্বারোহী সৈন্য "বর্গী" ও শিল্লীদার", এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গীরা অশ্ব এবং মাসে ৬।৭ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। শিল্লীদারেরা আপনাদের অশ্বে কাজ করিত। ইহাদের বেতন ১৮।২০ টাকা হইতে ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। লুণ্ঠনে যাহা পাওয়া যাইত তৎসমুদয় রাজ-কোষে জমা হইত। লুণ্ঠনকারীরা কেবল উপযুক্ত পারিতোষিক পাইত। ১০ জন সৈন্যের উপর এক জন নায়ক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবিলদার ও ১০০ জনের

উপর এক জন জুমলদার থাকিত। এক হাজার পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে এক হাজারী এবং পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী বলা যাইত। পাঁচ হাজারীর উপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন।

পদাতিকদিগের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্যেরও শ্রেণী ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার, ১২৫ জনের উপর জুমলদার ও ৬২৫ জনের উপর সুবাদার ছিল। ৬,২৫০ জন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী কহা যাইত। তরবারি, ঢাল ও বড়শা অশ্বারোহীগণের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহাদের অশ্বগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব ও দ্রুতগামী হওয়াতে ইহারা অনায়াসে ত্বরিত গতিতে পার্ব্বত্যপ্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত।

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্বিজয়-যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবজী এই সময়ে মহাআড়ম্বরে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। শিবজী শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই রূপে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর মহারাষ্ট্র রাজ্য স্থাপিত হইল, এইরূপে মরহাট্টাগণ সাধারণের নিকট একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিল।

**শিবজীর সহিত যুদ্ধ, ১৬৭০।**—আওরঙ্গজেব যে কোন প্রকারে হউক, শিবজীকে হস্তগত করিবার উপায় দেখিতেছিলেন; কিন্তু চতুর শিবজী ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চক্রান্তে পা দিলেন না। ইহাতে আওরঙ্গজেব উপায়ান্তর না

দেখিয়া শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করিলেন। শিবজী প্রথমে সুরত ও খান্দেশ লুণ্ঠন করিলেন, সর্ব্বত্র চৌথ আদায় করিয়া লইলেন, পরে মোগল সেনাপতি মহব্বত খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন।

**সত্নরামী সম্প্রদায়, ১৬৭৬।**—ইহার পর আওরঙ্গজেব সত্নরামীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সাধু নামে ঈশ্বরনিষ্ঠ এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা একেশ্বরবাদী, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী ছিল। ভিক্ষা ও ভূমি-কর্ষণ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করিত। ফসলের সময় রাজকীয় পদাতিকেরা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, রাজ-কর না দিয়া কেহ ফসল লইয়া যাইতে পারিত না। কোন কথায় দিল্লীর অদূরবর্ত্তী এক জন সত্নরামীর সহিত প্রহরীর বিবাদ হয়। ইহাতে প্রহরীর পক্ষীয় লোকেরা আসিয়া সত্ন-রামীকে অপমানিত করে। এজন্য সকল সত্নরামী একত্র দল-বদ্ধ হইয়া উঠে। সম্রাটের সৈন্য আসিলে ইহারা তাহাদিগকে পরাজিত করে। ইহার পর আওরঙ্গজেব সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলেন।

**আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার হ্রাস।**—এই সময় হইতে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে। দক্ষিণে মরহাট্টাগণ যেরূপ পরাক্রমশালী হয় তাহাতে সম্রাট্ তাহাদি-গকে দমন করিতে অসমর্থ হন। মুসলমান ধর্ম্মে আওরঙ্গ-জেবের অতিশয় গোঁড়ামি ছিল। যে জিজিয়া কর আকবর রহিত করিয়াছিলেন, সেই জিজিয়া কর আওরঙ্গজেব পুনঃ স্থাপিত করেন। মুসলমান ব্যতীত সকল হিন্দুকেই উহা দিতে হইত।

এজন্য হিন্দুগণ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। বিশেষ রাজপুত-গণ সাম্রাজ্য রক্ষার সহায় ছিলেন। ইঁহাদের বাহুবলে অনেক স্থলে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব মহারাজ যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও সন্তানদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজপুতদিগকেও বিপক্ষ করিয়া তুলেন। এইরূপে আওরঙ্গজেবের অনেক শত্রু হয়, এইরূপে আও-রঙ্গজেবের প্রতাপ খর্ব্ব হইতে থাকে।

যশোবন্ত সিংহ রাজপুতদিগের মধ্যে সাতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি সম্রাটের কার্য্যে কাবুলে গমন কল্লেন। "জিজিয়া" কর স্থাপনের কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী ও সন্তানগণ স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। দুর্গাদাস নামক এক জন পরাক্রান্ত রাজপুত ইঁহাদের রক্ষক হন। নিজের অনুমতি ব্যতীত ইঁহারা আসিয়াছেন বলিয়া, আওরঙ্গ-জেব ইঁহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে রাজপুতেরা আপনাদিগকে যার-পর-নাই অপমানিত জ্ঞান করেন। দুর্গাদাস, জয়পুরের রামসিংহ ও মিবারের রাজসিংহ সমবেত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইহাতে আওরঙ্গজেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন (১৬৭৮)।

আকবরের বিদ্রোহ।—এদিকে দুর্গাদাস আর এক চাতুরী খেলিলেন। তিনি রাজ্য দেওয়াইবার লোভ দেখাইয়া সম্রাটের পুত্র যুবরাজ আকবরকে আপনার দলভুক্ত করিলেন। আকবর ৭০,০০০ সৈন্য লইয়া আজমীঢ়ে পিতার সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সম্রাট্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সমুদয় সৈন্য আপন দলে আনিলেন। ইহাতে আকবর মর্-

ভট্টাদিগের শরণাপন্ন হন। এদিকে উদয়পুর-রাজের সহিত আওরঙ্গজেবের সন্ধি হয় (১৬৮১)।

শিবজীর কৃতকার্য্যতা।—শিবজী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রায় সমুদয় দক্ষিণাপথ হস্তগত করেন। বেরার ও খান্দেশ লুণ্ঠিত হয়, কর্ণূল, কড়ালুর, ও জিঞ্জি অধিকৃত হয়, এবং বিলোর, তাঞ্জোর ও মহীশূর হস্তগত হইয়া উঠে। এজন্য শিবজীর প্রতাপ সকলেরই ভীতি-স্থল হইয়া দাঁড়ায়।

শিবজীর মৃত্যু ১৬৮০।—এইরূপে প্রবল-প্রতাপ মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শিবজী লোকান্তরিত হন। তিনি যদিও লেখাপড়া জানিতেন না, তথাপি রাজ্যশাসনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাহার ক্ষমতা অসাধারণ ও সাহস অতুল্য ছিল। তিনি প্রথমে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়াও ক্ষমতা ও সাহসের বলে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। আওরঙ্গজেবের উপর তিনি বিশেষ বিদ্বেষ দেখাইতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানেরা চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে। এই চতুর ও প্রবঞ্চকদিগের সহিত চাতুরী ও প্রবঞ্চনা করা অনুচিত নহে। শিবজী এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক মোগল সাম্রাজ্যের অনিষ্ট করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব যেমন মুসলমান-ধর্ম্মে আস্থা দেখাইতেন, শিবজীও তেমন হিন্দু-ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

শম্ভুজী।—শিবজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজী মহারাষ্ট্রের অধিপতি হইলেন। ইনি সর্ব্বদা বিলাস-সুখে মত্ত থাকিতেন। শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ মজ্জমকে পরাজিত করিয়া

অনেক স্থান লুণ্ঠন করেন। পরে তোকারাব খাঁ নামক এক জন মোগল সেনাপতি তাঁহাকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলে সম্রাট্ তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন।

শাহুজী।—শম্ভুজীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শাহু পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে থাকেন। রাজারাম বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শান্তজী ও দনাজীকে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন। ইহারা অনেক স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। সমস্ত দক্ষিণাপথে মহা হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিল।

জিঞ্জিরদুর্গ আক্রমণ।—কর্ণাটের অন্তঃপাতী জিঞ্জির দুর্গ মর্‌হাট্টাদের অধীনে ছিল। রাজারাম এই দুর্গে থাকিতেন। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জোল্‌ফোক্‌রে দুর্গ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু রাজারামকে ধরিতে পারিলেন না। রাজারাম সেতারায় পলায়ন করিলেন।

দক্ষিণাপথের রাজ্য অধিকার।—দক্ষিণাপথের পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিদর, অহমদনগর ও ইলিচপুর আওরঙ্গজেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইযাছিল। কেবল গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। আওরঙ্গজেব ঐ দুই রাজ্য অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু প্রথমে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। শেষে আওরঙ্গজেব বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন। তিনি পঁচিশ বৎসর এই স্থানে থাকিয়া আপনার অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৬৮৮ অব্দে গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর অধিকৃত হয়। ইহার পর সেতারা (১৭০০) ও শেষে মর্‌হাট্টাদের

অনেকগুলি দুর্গ আওরঙ্গজেবের অধিকারে আইসে (১৭০৪)। রাজারাম এই সময়ে লোকান্তরিত হন।

**আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতি।**—আওরঙ্গজেবের বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। যদিও তিনি এ বয়সে সবল ছিলেন, তথাপি রাজ্যের গোলযোগ ও দুশ্চিন্তায় শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবলম্বিত নীতি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। আকবর উদারতা ও সমদর্শিতার বলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বে এ উদারতা ও সমদর্শিতা বিলুপ্ত হয়। আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার জন্য "জিজিয়া" কর প্রচলিত করেন, বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি যশোবন্তসিংহের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানগণের প্রতি অসৌজন্য দেখান এবং হিন্দু-ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। এই সকল কারণে হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এ দিকে রাজ্যমধ্যে সর্ব্বদা কলহ হইতে লাগিল; মহারাট্টাদের আক্রমণে পথঘাট বন্ধ হইল। অপর দিকে শিখগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল; দারুণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের মৃত্যু হইতে লাগিল। সৈন্যদিগের বেতন বাকী পড়াতে তাহারা বিদ্রোহী হইতে উদ্যত হইল, এই সমস্ত কারণে আওরঙ্গজেব বিষণ্ণচিত্তে অহমদনগরে আসিলেন। এই স্থানে দুরন্ত রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

**আওরঙ্গজেবের মৃত্যু, ১৭০৭।**—এই অহমদনগরেই ৮৯ বৎসর বয়সে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় (২১এ ফেব্রুয়ারি)। পীড়ার সময়, তিনি কাহাকেও আপনার শয্যার পার্শ্বে আসিতে দেন নাই।

**আওরঙ্গজেবের চরিত্র।**—আওরঙ্গজেব সকলের কাছে প্রগাঢ় ধার্ম্মিক মুসলমান বলিয়া, পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। বাহিরে তাঁহার সাজ সজ্জা আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, কিন্তু গৃহে তিনি সামান্যভাবে থাকিতেন। তিনি পরিশ্রমী, সুলেখক ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। শিল্পকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি ঘরে বসিয়া অতি সুন্দর টুপী প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার ইচ্ছায় ঐ টুপীর বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারাই তদীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যদি তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ ভ্রাতা-দিগকে নিহত ও হিন্দুদিগকে নিপীড়িত না করিতেন, তাঁহা হইলে তাঁহার চরিত্র প্রশংসনীয় হইত। তিনি যদিও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তথাপি তাদৃশ প্রতিভা-সম্পন্ন বা দূরদর্শী ছিলেন না। সমদর্শিতা না থাকিলে কিরূপ অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন না। তিনি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ ছিলেন। আপনি পিতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিযাছেন, পাছে তাঁহার সন্তান-গণও তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করেন, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন। দিবসে তাঁহার শান্তি ছিল না, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা ছিল না, হৃদয়ে তাঁহার সন্তোষ ছিল না। তাঁহার প্রপিতামহ আকবর যে সকল সুনিয়ম করেন, তাঁহার রাজ্যে তৎসমুদয় উৎসন্ন হইয়া যায়। রাজা অত্যাচারী, অবিশ্বাসী ও অদূরদর্শী হইলে রাজ্যের কিরূপ দুরবস্থা ঘটে, তাহা আওরঙ্গজেবের রাজত্বে প্রকাশ পাইতেছে। আওরঙ্গজেব একটি বদ্ধমূল ও প্রতাপান্বিত রাজ্যের অধিপতি হন, দীর্ঘকাল শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন, পরিশেষে আপনার অব্যবস্থিততা প্রযুক্ত সেই রাজ্যেরই অধঃপতনের সূত্রপাত করিয়া যান।

**আওরঙ্গজেবের রাজস্ব।**—আসাম ব্যতীত সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ স্থান হইতে আওরঙ্গজেব রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্যের পরিমাণের প্রায় তুল্য ছিল। আওরঙ্গজেবের এই বিপুল সাম্রাজ্যের ভূমির রাজস্ব ৩০ হইতে ৩৮ কোটী টাকা ছিল। কোনও সময়ে এই ৩৮ কোটী টাকা একবারে আদায় হইত কি না, সন্দেহ। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ বৎসর ভূমির রাজস্ব ৩০ কোটী টাকা আদায় হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার রাজত্ব-কালে ভূমির রাজস্ব গড়ে ৩৪,৫০,৫৮,৯০০ টাকা ছিল। ১৭৬১ অব্দে যখন আহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন ধন-ভাণ্ডারের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, মোগল-সাম্রাজ্যের ভূমির রাজস্ব সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪,৫০,৬৬,৪০০ টাকা। দক্ষিণাপথ আওরঙ্গজেবের অধিকার-ভুক্ত হইলে ভূমির রাজস্ব সাড়ে ৩৮ কোটী টাকা হয়। কাশ্মীর ও কাবুলের রাজস্ব উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূমির ও অন্যান্য বিষয়ের কর ইত্যাদিতে আওরঙ্গজেবের রাজস্ব ১৬৯৫ অব্দে ৮০ কোটী টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৯৭ অব্দে উহা সাড়ে ৭৭ কোটী হইয়াছিল।

## আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ ১৭০৭-১৭৬১।

(পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্য্যন্ত)

**বাহাদুর শাহ, ১৭০৭-১৭১২।**—আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ মাজ্জম "বাহাদুর শাহ" নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইনি জোল্‌ফোকরে খাঁ ও তাঁহার পিতা

আসদ খাঁকে সম্মানের সহিত রাজধানীতে রাখেন। বাহাদুর ইহার পর যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও উদয়পুর, এবং মাড়বার ও জয়পুররাজের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন।

**শিখগণ।**—শিখ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নানকের মৃত্যুর পর কয়েক ব্যক্তি শিখদিগের গুরু হন। দশম গুরুর নাম গোবিন্দ সিংহ। ইনি শিখদিগকে, অস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত করেন। গুরু গোবিন্দের পর বন্ধু গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন, ইনি পঞ্জাবে আসিয়া উৎপাত করাতে বাহাদুর তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়াইয়া দেন (১৭১১)।

ইহার পরবর্ত্তী বৎসর বাহাদুরের মৃত্যু হয়। অনেক হত্যা-কাণ্ড ও যুদ্ধের পর জাঁহাদার শাহ রাজপদ গ্রহণ করেন।

**জাঁহাদার শাহ, ১৭১২-১৭১৩।**—জাঁহাদার শাহ জোল্‌ফোকরে খাঁকে মন্ত্রী করেন। পর বৎসর তাঁহার ভ্রাতৃ পুত্র ফররোখ্‌সয়ের বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে আই-সেন এবং জাহাঁদার ও জোল্‌ফোকরে খাঁকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

**ফররোখসয়ের, ১৭১৩-১৭১৯।**—ফররোখসয়ের প্রধানতঃ সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ ও সৈয়দ আবদুল্লার সাহায্যে রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি শেষে ইহাদের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ হোসেন দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন, এই সময় সম্রাট্ তত্রত্য শাসনকর্ত্তা দায়ুদকে হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে গোপনে অনুরোধ করেন। দায়ুদ ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু শেষে এই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। এ দিকে সম্রাট্ আবদুল্লাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করাতে হোসেন দক্ষিণা-

পথ হইতে আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ফর্‌রোখ্‌সয়েরের রাজত্বে শিখগণ মোগল-সৈন্যের হাতে অত্যাচারের এক শেষ ভুগিতে থাকে। শিখগুরু বন্দু ৭ শত অনুচরসমেত ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন। অনুচরগণের শিরশ্ছেদ হয়। বন্দুকে লৌহ-পিঞ্জরে রুদ্ধ ও সুবর্ণ-রঞ্জিত বসনে পরিহিত করিয়া প্রথমে নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। দুরন্ত ঘাতক বন্দুর শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার রুধির ইত্যাদি পিতৃমুখে নিক্ষেপ করে, পরে বন্দুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এত অত্যাচারেও শিখগণ সাহসশূন্য হয় নাই। অত্যাচারে ও অবিচারে ক্রমে তাহাদের সাহস ও পরাক্রম বাড়িতে থাকে। শেষে এই পরাক্রম ও সাহসের বলে তাহারা সম্মুখ-সমরে অরাতিনিপাতে সমর্থ হয়।

ফর্‌রোখসয়ের নিহত হইলে সৈয়দেরা ক্রমান্বয়ে সমস্‌ উদ্দীন আবুয়ল বর্‌ফাত ও রফিউদ্দৌলা নামক দুই ব্যক্তিকে রাজা করিয়া পদচ্যুত করেন। অবশেষে মহম্মদ শাহ দিল্লীর অধিপতি হন।

**মহম্মদ শাহ, ১৭১৯-১৭৪৮।**—আবুয়লফতে নাসের উদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কয়েক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মালবের শাসনকর্ত্তা আসফজা স্বাধীন হইয়া সম্রাটের সৈন্য পরাজিত করেন (১৭২০)। এই যুদ্ধে সৈয়দেরা সেনা-নায়ক ছিলেন। যুদ্ধের পর সম্রাটের আদেশে সৈয়দ হোসেন নিহত হন এবং সৈয়দ আবদুল্লা অন্য ব্যক্তিকে রাজা করিবার চেষ্টা পাওয়ায় কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন।

মহম্মদ শাহ আসফজাকে বিশেষ শাস্তি দিতে হয়দরাবাদের শাসনকর্ত্তা মবারিজকে অনুরোধ করাতে, আসফ মবারিজকে

পরাজিত ও নিহত করেন, এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন ( ১৭২৫ )

পেশবা।—আওরঙ্গজেব শম্ভুজীকে হত্যা করিয়া তদীয় পুত্র শাহুকে বন্দী করেন। রাজারাম শাহুর নামে রাজ্য শাসন করিতেন। শাহু ১৭০৭ অব্দে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, মহারাষ্ট্রে যাইয়া বলজী বিশ্বনাথকে আপন রাজ্যের মন্ত্রী করেন। এই মন্ত্রীর উপাধি "পেশবা" হয়। বলজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বাজীরাও পেশবা হন। বাজীরাও অতিশয় কর্ম্মক্ষম ছিলেন। শিবজীর পর তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি মরহাট্টাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিন মোগল-শাসন উচ্ছেদের জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া উঠেন। এই অবধি পেশবারই অসাধারণ প্রভুত্ব হয়; শিবজীর বংশধরগণ সেতারায় সাক্ষীগোপালের ন্যায় থাকেন। এ দিকে রাজারামের পুত্র শম্ভুজী, তাঁহার মাতা তারাবাইর সাহায্যে কোলাপুরে আধিপত্য স্থাপন করেন।

বাজীরাও মালব ও গুজরাট অধিকার করেন এবং বুন্দেল খণ্ডে প্রবেশ করিয়া তথায় আধিপত্য বদ্ধমূল্য করিয়া তুলেন। ইহার পর যমুনার তীরবর্ত্তী দেশসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত উপস্থিত হন ( ১৭৩৭ )। কিন্তু তিনি দিল্লী আক্রমণ করেন নাই। আসফজা দিল্লীর সেনাপতি হইয়া ইহার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন, শেষে পরাজিত হইয়া নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই মরহাট্টা সৈন্যের অধিনায়ক উদয়জীপুয়ার, মহ্লার হোলকার ও রণজী সিন্ধিয়া হইতে তিনটি রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষে আর এক বিপদ আসিয়া পড়ে।

**নাদের শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ, ১৭৩৯।—** নাদের শাহ খোরাসান-বাসী। পারস্থের রাজা তমাস্প্ খিল্জীদিগকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে নাদেরের সহায়তায় পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করেন। পরিশেষে নাদের তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, এবং বহুসংখ্য পারশীক সৈন্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আইসেন। নাদের লাহোর অধিকার করিয়া কর্ণালে মহম্মদ শাহকে পরাজিত করেন। এইরূপে দিল্লীরাজ নাদেরের শরণাপন্ন হইলে নাদের তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে উপনীত হন। প্রথমে নাদেরের সৈন্য শান্তভাবে দিল্লীতে অবস্থিতি করে, কিন্তু শেষে নাদেরের মৃত্যুর সম্বন্ধে একটা অমূলক জনরব প্রচারিত হওয়াতে নগরবাসিগণ উৎসাহিত হইয়া কয়েক জন পারশীকের প্রাণসংহার করে। এজন্য নাদেরের সৈন্যগণ দিল্লীর অধিবাসীদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তুলে। নাদের অপরিমিত ধনরাশি লইয়া পারস্থে প্রতিগমন করেন (১৭৪০)।

নাদের চলিয়া গেলে মহারাট্টাগণ আবার জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে পেশরা বাজীরাওর হঠাৎ মৃত্যু হয় (১৭৪০) তৎপুত্র বলজীরাও পেশবা হইয়া মালব আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৭৪৪)।

ইহার চারি বৎসর পরে শাহুর মৃত্যু হয়। রাজারামের পৌত্র দ্বিতীয় রাজারাম তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

**আহম্মদ খাঁ দোর্‌রাণীর ১ম আক্রমণ।—** ১৭৪৭ অব্দে নাদের শাহ নিহত হন, এবং দোর্‌রাণী জাতির (ইহারা আফগানবংশীয় এবং "আবদালী" নামেও প্রসিদ্ধ) অধ্যক্ষ

আহম্মদ খাঁ পঞ্জাব আক্রমণ করেন। মহম্মদ শাহের পুত্র অহম্মদের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়।

পর বৎসর মহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র অহম্মদ শাহ রাজ্য অধিকার করেন।

**অহম্মদ শাহ, ১৭৪৮-১৭৫৪।**—অহম্মদ শাহের সময় রোহিলা নামক রোহিলখণ্ডবাসী আফগানেরা অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা ক্রমে এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের গতি রোধ করিতে অহম্মদ শাহের শক্তি ছিল না। সুতরাং রাজমন্ত্রী মর্‌হাট্টাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মর্‌হাট্টারা আসিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিল। মর্‌হাট্টা সেনাপতি সিন্ধিয়া ও হোলকার পুরস্কার স্বরূপ জায়গীর পাইলেন।

**আহম্মদ খাঁ দোর্‌রাণীর ২য় আক্রমণ।**—১৭৫৩ অব্দে অহম্মদ খাঁ দোর্‌রাণী পঞ্জাবে আসিয়া ঐ স্থান অধিকার করেন, এবং "শাহ" উপাধি ধারণ করিয়া ফিরিয়া যান। ইহার পর বৎসর আসফজার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী উদ্দীনের সহিত অহম্মদ শাহের বিবাদ হয়। ইহাতে গাজী উদ্দীন তাঁহাকে পরাজিত, অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত করেন।

**দ্বিতীয় আলম্‌গীর, ১৭৫৪-১৭৫৯**—গাজী উদ্দীন ইহাকে সিংহাসনে আরোহিত করিয়া স্বয়ং রাজমন্ত্রী হন।

**আহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর দিল্লীতে আগমন।**—গাজী উদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আহম্মদ শাহের নিয়োজিত পঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তার বিধবা পত্নীকে কারারুদ্ধ করিলে আহম্মদ ক্রোধান্ধ হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন, এবং উহা এক-

বারে বিধ্বস্ত করিয়া, গাজী উদ্দীনের প্রভাব খর্ব্বের জন্য আর এক জন মন্ত্রী নিয়োগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করেন (১৭৫৭)। এ দিকে গাজী উদ্দীন মরহাট্টাদের সাহায্যে দিল্লী পুনরধিকার করেন।

**দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যু, ১৭৫৯।**—ইহার পর-বৎসর মরহাট্টা সেনাপতি রাঘব পঞ্জাব অধিকার করেন। পরবর্ত্তী বৎসর দ্বিতীয় আলমগীর গাজী উদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হন।

. **মরহাট্টাকর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার, ১৭৬০।**—এই সময় পেশবার প্রবল প্রতাপ। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার প্রতাপে কম্পিত হইতেছিল। দিল্লীর সিংহাসন শূন্য দেখিয়া পেশবা উহা লইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং মোগলদিগকে তাড়াইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ আপনাদের অধীনে আনিতে উদ্যত হইলেন। পেশবা, সদাশিব রাও ও বিশ্বনাথ নামক দুই জন সেনাপতিকে বহুসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য ও কামান ইত্যাদি দিয়া পাঠাইলেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতি অবলীলায় দিল্লী অধিকার করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদ্বয় শুনিতে পাইলেন, আহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী বহুসংখ্য রোহিলার সহিত যমুনা পার হইতেছেন, সুতরাং সদাশিব দ্রুতগতিতে পানিপথে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে আহম্মদ শাহও আসিয়া তাঁহার নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। এইরূপে যুদ্ধ-কুশল সেনাপতি-দ্বয়ের যুদ্ধকুশল ও সাহসী সৈন্যগণ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনার্থ দণ্ডায়মান হইল।

**পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৬১, ৬ই জানুয়ারি।** —এই যুদ্ধে আহম্মদ শাহ বিজয়ী হন মরহাট্টাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করে। পানিপথের যে প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, যে দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতবর্ষে আকবরের শাসন বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে এই তৃতীয় যুদ্ধ ভারতবর্ষে অন্য এক পরাক্রান্ত জাতির আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিল।

আহম্মদ শাহ বিজয়ী হইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর আর তিনি ভারতবর্ষে আইসেন নাই। মরহাট্টারা অবসন্ন হইয়া নর্ম্মদা-পারে উপস্থিত হইল। পেশবা এই পরাজয়ের সংবাদে ভগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই দুরন্ত রোগ আসিয়া তাঁহার সমস্ত দুর্ভাবনার শেষ করিল।

**মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন, ১৭৬১-১৭৬৫।**— পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। মোগল সম্রাটগণ গৌরবভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। যদিও ইঁহারা দ্বিতীয় আকবর প্রভৃতি উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিতেন, তথাপি ইঁহাদের কোনও ক্ষমতা বা প্রাধান্য ছিল না। এই সময়ে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন। ক্রমে ভারতবর্ষ ইহাদেরই হস্তগত হয়। দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলিগোহর "শাহ আলম" নাম পরিগ্রহ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের রক্ষাধীনে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

**মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ।**— আকবর ভারতের হিন্দুরাজগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল করেন। হিন্দুগণের সাহসে ও পরাক্রমেই রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর ক্ষমতা রোধ হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতির দোষে হিন্দুগণ বিরক্ত হইয়া উঠেন। সুতরাং তাঁহার সময় হইতেই রাজ্যের বল হ্রাস হইতে থাকে। মুসলমান আক্রমণকারিগণ আফগানিস্তান হইতে ভারতবর্ষে উৎপাত আরম্ভ করে। রাজ্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশে স্বপ্রধান হইতে থাকেন। পরাক্রান্ত হিন্দুরাজারা ইহাদের ক্ষমতা রোধ করিতে উদ্যত হন নাই। এদিকে শিখ ও মহারাট্টারা পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। প্রধানতঃ এই সকল কারণেই মোগলদিগের বিপুল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়।

**ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা।**—মোগল শাসন-প্রণালী সর্ব্বাংশে যথেচ্ছাচার ছিল। সম্রাট্ ইচ্ছানুসারে লোককে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, উন্নত করিতে পারিতেন, সম্মানিত বা অপদস্থ করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে তাঁহার ইচ্ছাই বিধি ছিল। তিনি ইচ্ছানুসারে কর নির্দ্ধারিত করিতেন, ইচ্ছা হইলে সেই করের হার বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার ইচ্ছায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পদচ্যুত হইতেন, এবং এক জন সামান্য লোক সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজ্যে এরূপ যথেচ্ছাচার-প্রণালী থাকিলেও মোগল-শাসন-কালের প্রথমাংশে প্রজারা বিশেষ সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য সম্রাট্কে কোন রূপ

কষ্ট পাইতে হইত না। ভূমি প্রচুর শস্যশালিনী ও রাজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল। প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে রাজাকে নিয়মিতরূপে কর দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইত। সম্রাট্ নিত্য নূতন কর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতেন না।

এই প্রথম অবস্থায় সম্রাট্গণ প্রায়ই বিনয়ী, উদারচিত্ত ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয় ছিলেন, এবং ভারতবর্ষীয় হইয়া ভারতবর্ষের উন্নতি ও মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিতেন। ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের জেতৃ-বিজিত সম্বন্ধ ছিল না। এ সম্বন্ধ তাঁহারা একবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। আকবর শাহ রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। মোগল সম্রাট্গণ ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া আদর করিতে কাতর হইতেন না। তাঁহারা সমুদয় উপযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ করিতেন না। আকবরের সময়ে তোড়রমল প্রধান রাজস্ব-মন্ত্রী ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মিরজুম্লা নামমাত্র মন্ত্রী হইলেও রাজা রঘুনাথ আওরঙ্গজেবের মন্ত্রিত্ব এবং জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রধান সেনাপতিত্ব করিতেন। রতনচাঁদ ফররোখসয়েরের প্রধান মন্ত্রীর কায চালাইতেন। বিক্রমজিৎ ও রাজা ভীম, শাহজহাঁর প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সহায় ছিলেন। সুতরাং মোগল-ভূপতিগণ জাতিগত ও ব্যক্তি-

গত বৈষম্য দূর করিয়া, উপযুক্ত বোধ হইলে সকলকেই এক ভূমিতে দণ্ডায়মান করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং ব্যসনাসক্ত হই-লেও প্রজাদের মধ্যে যাহাতে উক্ত দোষ দূর হয়, তাহার চেষ্টা পাইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা জাঁকজমকে মত্ত থাকিলেও সর্ব্বদা প্রজা-শোষণে বিরত ছিলেন। আকবর আপনার রাজত্ব-সময়ে সমদর্শিতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। জাহাঁগীর স্বয়ং মদ্যপায়ী হইলেও রাজ্য-মধ্যে মদ্যপান ও তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে বাণিজ্যের ক্ষতি হইলেও প্রজা-দের ক্ষতি করিতে উদ্যত হন নাই। শাহজহাঁ অট্টালিকা প্রভৃতির নির্ম্মাণে ও বহুসংখ্য সৈন্যের ভরণ-পোষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও রাজ্যের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। এত ব্যয় করিয়াও তিনি ধনাগারে নগদ ২৪,০০,০০,০০০ টাকা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। অথচ শাহজহাঁ নূতন কর করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন নাই।

কিন্তু এ ন্যায়পরতা, উদারতা, ও বিবেক-বুদ্ধি শাহজহাঁর সহিতই তিরোহিত হইল। পরবর্ত্তী সম্রাট্ অব্যবস্থিত-চিত্ত ও প্রজার হিতসাধনে উদাসীন হইলেন। এ দিকে মরহাট্টা ও শিখেরা প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে মোগল-সম্রাজ্য বিশৃ-ঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

আকবরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আকবর আপনার সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। আপন আপন সুবায় সুবাদারদিগের অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। সুবাদারেরা কর সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের নিকট পাঠাতেন। প্রতি সুবায় শান্তিরক্ষার ভার

ফৌজদারদিগের উপর ছিল। পল্লীবাসীদিগকে সকল সময়ে রাজ-দরবারে যাইতে হইত না। কোন রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রামের মণ্ডল ও পঞ্চায়ত দ্বারা তাহার মীমাংসা হইত। প্রজারা আপনাদের কর জমীদারকে দিত। জমীদার উহা হইতে রাজার প্রাপ্য অংশ সুবাদারের নিকট পাঠাইতেন। এইরূপে সমস্ত সুবার কর সংগৃহীত হইলে উহা দিল্লীতে প্রেরিত হইত। কিন্তু প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা প্রজাদের উপর অনেক সময়ে অত্যাচার করিতেন। এইরূপ যথেচ্ছাচার ভারতবর্ষের অনেক রাজত্বেই দেখা যায়।

জাঁহাগীরের রাজত্ব-কালে ইঙ্গলণ্ড হইতে স্যার তমাস্ রো নামক একজন দূত এতদ্দেশে আইসেন। মোগল সম্রাটের দৈনন্দিন কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, তাহা ইহার লিখিত বিবরণে জানা যায়। স্যার তমাস রো লিখিয়াছিলেন, "সম্রাট্ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া, নীচে যে সকল প্রজা রাজ-দর্শনেচ্ছু হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে দর্শন দিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পুনর্ব্বার সেই গবাক্ষদেশ দিয়া ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির যুদ্ধ দেখিতেন। অপরাহ্নে তাঁহাকে দরবারে বসিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। রাজ-দরবারে যাইবার সকলেরই অধিকার ছিল। দরবার শেষ হইলে সম্রাট্ সন্ধ্যার সময় নিভৃত গৃহে যাইয়া বিশ্বস্ত অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেন। এই নিভৃত গৃহের নাম, "গোসলখানা" ছিল।

যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের হস্তে শাসন-দণ্ড ছিল, তখন বেণীয়ে নামক একজন ফরাসী ভ্রমণকারী অনেক দিন এতদ্দেশে বাস করিয়াছিলেন। বেণীয়ে আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারত-

বর্ষের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার অনেক স্থান মিশর দেশ অপেক্ষাও উর্ব্বর। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত ধান্য, তুলা, নীল ও রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানই বহু-লোকাকীর্ণ। শিল্পিগণ শাল, গালিচা, রেশম ও সুতার কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এই সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময়ে পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আসিয়া ভারতবর্ষে জমা হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অপর দেশোৎপন্ন দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে না। সুতরাং এই স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রায় সমস্তই অন্যত্র না গিয়া ভারতবর্ষে থাকিয়া যায়। এ জন্য অতি সামান্য অবস্থার লোকও আপনার স্ত্রীকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার দিয়া থাকে।

"ভারতবর্ষের আমদানি দ্রব্য অনেক প্রকারের। ইঙ্গ্লণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে সীসক; ফরাসী দেশ হইতে কাপড়; তাতার, আরব, পারস্য দেশ হইতে অশ্ব; বুখারা প্রভৃতি স্থান হইতে আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্ প্রভৃতি; মাল দ্বীপ হইতে কড়ি; মিশর দেশ হইতে গণ্ডারের শৃঙ্গ, হস্তীদন্ত ও ক্রীতদাস; চীন দেশ হইতে মৃগনাভি ও কাচের বাসন, এবং সিংহল দ্বীপ হইতে হস্তী, নানারূপ মসলা ও মুক্তা আইসে।

"রাজপুত রাজা ও ওমরাহগণ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য মাসে ২৫ টাকা বেতন পায়। পদাতিকদিগের বেতন শ্রেণী অনুসারে, দশ, পনর ও কুড়ি টাকা। ইঙ্গরেজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ বা ওলন্দাজ সৈন্য কামান চালাইয়া থাকে। প্রথমে ইহারা মাসিক দুই শত টাকা বেতন পাইত। শেষে মোগলেরা কামান চালান অভ্যাস করিলে

ইহাদের বেতন ৩২ টাকা হয়। সম্রাটের নিকট প্রায় ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ১৫,০০০ পদাতিক থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সৈন্য একত্র করিলে সম্রাটের সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক হয়।

"সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তারা রাজকোষ হইতে আপনাদের বেতন প্রাপ্ত হন না। ইহাদিগকে জাইগীর দেওয়া হয়। সম্রাট জাইগীর ব্যতিরিক্ত অন্য ভূমি ইজারা করিয়া দেন। এই জাইগীরদার ও ইজারাদারেরা সময়ে সময়ে প্রজাদের উপর উৎপাত ও অত্যাচার করিয়া থাকে। ইহাদের ভয়ে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকেও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় কালাতিপাত করে, এবং আপনাদের সম্পত্তি মাটিতে পুতিয়া রাখে। শিল্পীরা ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাহসী হয় না, যেহেতু জাইগীরদারেরা উহা দেখিলেই লোভে পড়িয়া কাড়িয়া লয়। ইহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তর অবনতি হইয়া থাকে।

"বঙ্গদেশ শস্য সম্পত্তি-পূর্ণ। যেখানে যাওয়া যায়, সেই খানেই ইহার শ্যামল শোভা দেখিয়া নেত্র পরিতৃপ্ত হয়। এই দেশে এত ধান্য জন্মে যে, তদ্দ্বারা সমস্ত বাঙ্গালায় ও অন্যান্য অনেক দেশের লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। বাঙ্গালার চিনি, তুলা, রেশম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে। এই দেশে টাকায় কুড়িটি মুরগী পাওয়া যায়। হাঁস, ছাগল প্রভৃতির মূল্যও এইরূপ অল্প। মৎস্য এত পাওয়া যায় যে, তাহার সংখ্যা করা করা যায় না। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই দিকে বহুসংখ্য খাল দেখা যায়। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই সকল খাল কাটা হইয়াছে। খালের উভয় পার্শ্বে লোকা-

কীর্ণ নগর, পল্লী ও শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র আছে। যত বার দেখা যায়, তত বারই ঐ সকল দৃশ্য নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।”

এতদ্ব্যতীত আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, “মোগল-রাজত্বে প্রজারা করস্বরূপ স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা দিত। শস্য প্রদানের নিয়ম ছিল না। প্রথম কিস্তীর খাজানা দিবার সময় প্রজারা পরিচ্ছন্নবেশে আসিত।” পরাধীন ও অত্যাচরিত দেশও এক সময়ে কিরূপ সম্পত্তিশালী ছিল, তাহা এই সকল বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হয়।

বাঙ্গালার জমীদার।—মোগল-শাসনে বাঙ্গালীরা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। আইন আকবরীতে লিখিত আছে বাঙ্গালার জমীদারেরা ৮,০১,১৫৮, পদাতিক, ১,১৭৩ হস্তী, ৪,২৬০ কামান ও ৪,৪০০ নৌকা যোগাইতে পারিতেন। পরাক্রান্ত বার ভুঁইয়ার* বিবরণ অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দুর্গ ছিল, যুদ্ধপোত ছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধপোত দিয়া বাদশাহের সাহায্য করিতেন। ইহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হন। ইহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহারা আপনাআপনি স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যু-

* বার ভুঁইয়ার মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান।

দের আক্রমণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও সামরিক পোত রাখিতেন। মোগল-শাসনেও বাঙ্গালীর বীরত্ব অন্তর্হিত হয় নাই।

বাঙ্গালা গ্রন্থকার।—এতদ্ব্যতীত মোগল রাজত্বে বাঙ্গালায় অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে কথকতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কথকেরা রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির কথা মধুর স্বর-সংযোগে গান করিয়া বেড়াইত। কাশীরাম দাস কথকদিগের নিকটে মহাভারতের কথা শুনিয়া প্রাঞ্জল পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। ইনি 'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ। কাটোয়ার নিকট সিঙ্গি গ্রামে ইঁহার বাস-স্থান ছিল। কাশীরামের মহাভারত ব্যতীত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, রামপ্রসাদের পদাবলী, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, এই সময়ে লিখিত হয়। জমীদারগণ পণ্ডিত ও গুণী লোকের সমাদর করিতেন, এবং নিষ্কর ভূমি প্রভৃতি দিয়া ইঁহাদের অর্থ-চিন্তা দূর করিয়া দিতেন। অনেক গ্রন্থকার এই সকল জমীদারের আশ্রয়ে থাকিতেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেদিনীপুরের জমীদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিতেন। রঘুনাথ রায়ের আদেশে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র রায় নদিয়ার জমীদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রিত ছিলেন। রামপ্রসাদ সেন বৈদ্যজাতীয়। ইনি হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরশুট পরগণায় পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের আবাস-বাটী ছিল। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন যে, মোগল-রাজত্বে কৃত্তিবাসের

আবির্ভাব হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস, পাঠান কি মোগল-রাজত্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। কাশী-রামের ন্যায় কৃত্তিবাসও কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুঁকুড়া কৃষ্ণপুরে ইঁহার জন্ম হয়।

সন।—'বাঙ্গালা,' 'ফস্‌লী' ও 'বিলায়তী' সন নামে যে কয়েকটি অব্দ প্রচলিত আছে, আকবরের রাজত্বে তৎসমুদয়ের উৎপত্তি হয়। আকবর আপনার আধিপত্য-সময়ে হিজরীর চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর গণনার নিয়ম করেন। যখন (১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দে) তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ৯৬৩ হিজরী চলিতেছিল। এই ৯৬৩ হিজরী সৌরবৎসরে যোগ করিলে বঙ্গাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়*। বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের, ও তৎপরবর্ত্তী ভাদ্র মাসে ফস্‌লী ও বিলায়তী সনের গণনা আরম্ভ হয়।

মোগল-রাজত্বে ইঙ্গরেজেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া নানা স্থানে কুঠি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এদিকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরাও আসিয়া উপস্থিত হন। শেষে এই ইঙ্গরেজ বণিক-কোম্পানি ফরাসীদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়া উঠেন। এক্ষণে ইঁহাদের বিবরণ ভারতের ইতিহাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

* যেমন, ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩২৯ সৌর-বৎসর গত হইয়াছে। ইহার সহিত ৯৬৩ হিজরী যোগ কর, বঙ্গাব্দ ১২৯২ হইবে।

# পরিশিষ্ট।

## বংশাবলী।

### দিল্লীর দাসরাজ-বংশ, ১২০৬-১২৮৮।

১ কোতবদ্দিন ইবক্।
(১২০৬-১২১০)
মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস ও সেনাপতি,
দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা।

২ আরাম
(১২১০)
ভগিনীপতি শমসউদ্দীন আলতমস্
কর্তৃক পদচ্যুত।

এক কন্যা
৩ শমসউদ্দীন আলতমাসের
সহিত পরিণীত।
আলতমস্ ১২১১ হইতে ১২৩৬ অব্দ
পর্য্যন্ত সুনিয়মে রাজ্য শাসন করেন।

৪ রোকোনদ্দিন ফিরোজ

৫ সুলতানা রেজিয়া

৬ মাজাদ্দিন বাহরাম

৪ রোকোনদ্দিন ফিরোজ
(১২৩৬)
অকর্ম্মণ্য, রাজ্যচ্যুত।

৭ আলাউদ্দীন মসউদ
(১২৪১-১২৪৬)
ইন্দ্রিয়পর ও অকর্ম্মণ্য, নিহত।

৫ সুলতানা রেজিয়া
(১২৩৬-১২৩৯)
রাজ্য শাসনে দক্ষা কিন্তু রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিহতা।

৬ মাজাদ্দিন বহ্রাম
(১২৩৯-১২৪১)
নিহত।

৮ নাসেরউদ্দীন মহম্মদ
(১২৪৬-১২৬৫)
ক্ষমতাপন্ন, বিনয়ী, শিষ্টাচারী। অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গত হওয়াতে প্রধান মন্ত্রী গেয়াসদ্দিন বোলবন্ সিংহাসন গ্রহণ করেন।

৯ গেয়াসদ্দিন বোলবন্
(১২৬৬-১২৮৬)
জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয়ে লোকান্তরিত।

মহম্মদ | বখর খাঁ

মহম্মদ।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত।

ইঁহারই মৃত্যুতে বোলবনের হৃদয় অবসন্ন হয়।

কায়খসরু

কায়কোবাদের মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত (অপুত্রক)

বখর খাঁ

বাঙ্গালার অধিপত্য প্রাপ্ত হন।

১০ কায়কোবাদ

(১২৮৬-১২৮৮)

অকর্ম্মণ্য, ইন্দ্রিয়পর। খিলজীবংশীয়

জালালউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত।

ইহার পর খিল্‌জীবংশীয় তিন জন ভূপতি (জালালউদ্দীন খিল্‌জী, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আলাউদ্দীন খিল্‌জী, এবং আলাউদ্দীনের পুত্র মোবারক খিল্‌জী) ১২৮৮ হইতে ১৩২১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

## তগলক-বংশ, ১৩২১-১৪১৪।

১ গেয়াসউদ্দীন তগলক

(১৩২১-১৩২৫)

২ মহম্মদ তগলক

(১৩২৫-১৩৫১)

প্রকৃত নাম জুনা খাঁ।

নৃশংস ও নীতিজ্ঞানশূন্য।

অপুত্রক অবস্থায় মৃত।

৩ ফিরোজ তগলক

(১৩৫১-১৩৮০)

অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

বাঙ্গালা ও দক্ষিণাপথ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন।

৩ ফিরোজ তগলক

৬ নাসেরউদ্দীন তগলক
(১৩৯০-১৩৯৪)

৫ আবুবকর তগলক
(১৩৮৯-১৩৯০)
কারারুদ্ধ ও পদচ্যুত।

৪ দ্বিতীয় গেয়াসউদ্দীন তগলক
(১৩৮৮-১৩৮৯)
রাজ্যচ্যুত।

৭ হুমায়ুন
১৫ দিনমাত্র রাজত্ব করেন।

মহম্মদ তগলক
১৩৯৪-১৪১৪

মালব, গুজরাট ও খান্দেশ স্বাধীন হয়।

তিমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

সৈয়দবংশীয় খেজের খাঁ কর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হয়।

সৈয়দবংশ, ১৪১৪-১৪৫০ ।

১ খেজের খাঁ

(১৪১৪-১৪২১)

|

২ মোবরক

(১৪২১-১৪৩৬)

মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত ।

|

৩ মহম্মদ ।

(১৪৩৬-১৪৪৪)

মালবের অধিপতি কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয় ।

|

৪ আলাউদ্দীন

(১৪৪৪-১৪৫০)

বদায়ূনে রাজধানী স্থাপিত হয় ।

এই অবসরে বহলুল লোদী দিল্লী আক্রমণ ও

অধিকার করেন ।

---

লোদীবংশ ১৪৫০-১৫২৬ ।

১ বহলুল লোদী

(১৪৫০-১৪৮৮)

দিল্লীরাজ্য বিস্তৃত হয় ।

|

২ সেকেন্দর লোদী

(১৪৮৮-১৫০৬)

বিহার অধিকৃত হয় ।

|

৩ এব্রাহিম লোদী

(১৫০৬-১৫২৬)

গর্ব্বিত ও দুর্বৃত্ত । কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলৎ খাঁ মোগলদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন । বাবর মোগলদিগের অধিনায়ক হইয়া পানিপথের যুদ্ধে এব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন ।

## মোগলবংশ, ১৫২৬-১৭৬১।

চঙ্গেস খাঁ

১১৬৪ অব্দে জন্ম ও ১২২৭ অব্দে মৃত্যু।

প্রথমে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া শেষে প্রায় সমগ্র এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

( মাতৃকুল হইতে )

তিমুরলঙ্গ

প্রথম পুত্র — পিতার জীবদ্দশায় মৃত
- পির মহম্মদ

মিরণশাহ — পিতার জীবদ্দশায় মৃত
- মির্জ্জা মহম্মদ
  - আবুসৈয়দ মির্জ্জা
    - অহম্মদ মির্জ্জা — সমরকন্দ ও বুখারার অধিপতি।
    - অহম্মদ মির্জ্জা — বলখের অধিপতি।
    - অলকবেগ মির্জ্জা — কাবুল ও গজনির অধিপতি।
    - ওমরসেখ মির্জ্জা — ফরগণার অধিপতি, চঙ্গেস খাঁর বংশোদ্ভব ও মোগল জাতীয় মহম্মদ খাঁর ভগিনীর সহিত পরিণীত।

কতিপয় পুত্র

শাহরোখ্
- আলকবেগ
  - আবদুল লতিফ্

ওমরসেখ মির্জা
১ বাবর
( ১৫২৬-১৫৩০ )
দিল্লীর প্রথম মোগল সম্রাট

- ২ হুমায়ুন
  (১৫৩০-১৫৪৩ ; ১৫৫৫ ১৫৫৬)
  দুই বার রাজত্ব করেন। শের শাহ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।
  - ৩ আকবর
    (১৫৫৬-১৬০৫)
    সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের কিয়দংশ অধিকার করেন।
    - ৪ জাহাঁগীর
      ৬ (১৬০৫-১৬২৭)
    - মোরাদ
      পিতার জীবদ্দশায় মৃত
    - দানিয়াল
      পিতার জীবদ্দশায় মৃত।
  - হাকিম
    কাবুলের শাসনকর্ত্তা।
- কামরাণ
  কাবুলের শাসন কর্ত্তা।
- হিন্দাল
  সম্ভলের শাসনকর্ত্তা।
- মির্জা আস্করী
  মেওয়ারের শাসনকর্ত্তা।

৪ জাঁহাগীর

- খসরু — পিতৃবিদ্রোহী, শেষে কারারুদ্ধ।
- পর্‌বেজ — অকর্ম্মণ্য।
- ৫ শাহজহাঁ (১৬২৭-১৬৫৮) — আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ।
  - দারা — আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিহত
    - সোলেমান — আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিহত।
  - সুজা — আরাকানে পলায়িত।
  - ৬ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) — শিবজী মহারাষ্ট্রে আধিপত্য স্থাপন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।
    - মহম্মদ সুলতান — কারারুদ্ধ। অপুত্রক।
    - ৭ বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২) — রাজপুত ও মরহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়।
    - আজিম — বাহাদুরের বিপক্ষতাচরণ করাতে নিহত। অপুত্রক।
    - কামবক্‌স্ — বাহাদুরের বিপক্ষে যুদ্ধে নিহত।
    - আকবর — পিতৃদ্রোহী হইয়া পলায়িত। অপুত্রক
  - মোরাদ — কারারুদ্ধ ও নিহত।

**বাহাদুর শাহ**

- ৮ জাহাঁদার শাহ
  (১৭১২-১৭১৩)
  ফর্‌রোখসয়ের কর্ত্তৃক
  নিহত।

- আজিম ওসান
  - ৯ ফর্‌রোখসয়ের
    (১৭১৩-১৭১৯)
    মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত।
    অপুত্রক।

১০ মহম্মদ শাহ
(১৭১৯-১৭৪৮)
ফর্‌রোখসয়েরের মৃত্যুর পর মোগল
রাজবংশীয় মহম্মদশাহ অধিপতি হন।
নাদের শাহের আক্রমণ।

- ১১ অহম্মদ শাহ
  (১৭৪৮-১৭৫৪)
  রাজ্যচ্যুত।

- ১২ দ্বিতীয় আলমগীর
  (১৭৫৪-১৭৫৯)
  আহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর আক্রমণ।
  - ১৩ শাহ আলম
    তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের পর এলাহাবাদে বাস করেন। সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। শেষে লর্ড লেক তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহিত করেন।
    - ১৪ আকবর
      (১৮০৬-১৮৩৭
      - ১৫ মহম্মদ বাহাদুর
        (১৮৩৭)
        সিপাহিযুদ্ধে লিপ্ত থাকার
        অপরাধে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত।

## শিবজীর বংশাবলী।

মালজী ভোঁসলা

শাহজী

১ শিবজী
(১৬৬৬-১৬৮০)
মহারাষ্ট্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

২ শম্ভুজী
(১৬৮০-১৬৮৯)
আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিহত।

৪ শাহু
(১৭০০-১৭৪৯)
শম্ভুজীর অত্যাচার সময়ে আওরঙ্গজেব শাহুকে কারারুদ্ধ করেন। শাহু অবশেষে বিমুক্ত হইয়া, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র শম্ভুজীকে সেতারা হইতে তাড়িত করিয়া পেশবার হস্তে রাজ্যশাসনের ভার দেন। অপুত্রক।

৩ রাজারাম
(১৬৮৯-১৭০০)
শাহুর নামে রাজ্য শাসন করেন

শম্ভুজী
(১৭০৮-১৭৪১)
সেতারা হইতে কোলাপুরে যাইয়া আধিপত্য স্থাপন করেন।

৫ দ্বিতীয় রাজারাম
(১৭৪৯)
ক্ষমতাশূন্য ও পেশবা কর্তৃক অবরুদ্ধ।